মে-জুলাই, ২০২৩

সমাজ সংস্কৃতি বিকাশের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

উন্নয়ন

উন্নয়ন

সমাজ সংস্কৃতি বিকাশের ত্রৈমাসিক মুখপত্র □ প্রথম সংকলন □
মে-জুলাই, ২০২৩

প্রকাশক ঃ অংশুমান দাস
সম্পাদক ঃ ড: দীপংকর রায়

সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ

সবুজ সংঘ
৩০/৯ রাজডাঙা মেইন রোড (পূর্ব)
কলকাতা—৭০০১০৭
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন ঃ ৯১৩৩৪০৭২৩৫৭৭,
৯৮৩১০০১৬৫৫,
৯৮৩০৯৭২১৩৬
ই-মেইল: director@sabujsangha.org

মুদ্রণ :
সহযাত্রী
৮, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন ঃ ৯৮৩১৭০৩৯৩৭

এই সংখ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

সম্পাদকীয়

জল দূষণ ও পরিবেশ □
ড: শ্যামাপ্রসাদ সিংহ রায় □ ৬

পৃথিবীতে আদিবাসীরাই পরিবেশ রক্ষা করে চলেছে □ শরদিন্দু ব্যানার্জী □ ৯

দূষণ ঘটছে সামাজিক আর প্রাকৃতিক দুটি পরিবেশেই □ অংশুমান দাস □ ১৩

সভ্যতাকে একটু থমকে দাঁড়াতে হবে □ ডা: অমিতাভ চৌধুরী □ ১৮

প্রচলিত জীবিকা থেকে সরে যাবার ফলে দূষণ হচ্ছে □ অক্ষয় খাটুয়া □ ২৫

অথ পরিবেশ বিষয়ে দু চার কথা □ ড: দীপংকর রায় □ ২৯

এত দূষণ, মিডিয়াগুলোর দায়িত্ব আছে বলে মনে হয় না □ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় □ ৪৬

পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত প্রবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের নিজস্ব ও ব্যক্তিগত

— সম্পাদক

পত্রিকা প্রকাশের খরচ : প্রতি কপি ৩০ টাকা। পাঠক দান হিসেবে এটা দিতে পারবেন

প্রকাশকের নিবেদন ঃ

কেন এই পত্রিকা

'উন্নয়ন' নামে এই পত্রিকার বিষয়টা আমাদের ভাবনার মধ্যে এসেছে, তার কারণ, কোন্ কাজটা যে প্রকৃত 'উন্নয়ন', সেটা বোঝা এখন খুব দরকার। সবাই যে কাজটাই করেছে, সেগুলো সবই 'উন্নয়ন' হচ্ছে বলে প্রচারিত হচ্ছে। সবাই আমরা বলি উন্নয়ন হচ্ছে। সরকারও একধরনের কাজ করছেন। আসলে এটা আপেক্ষিক বিষয় বলেই মনে হয়। আমরা যারা অসরকারী সংগঠন, সিএসও হিসেবে আমরাও আমাদের কাজকে বলছি উন্নয়ন। তাই একটা নিজস্ব কোন প্লাটফর্ম থাকা দরকার এই সি এস ও দের জন্যে। সেখানে তাঁদের চিন্তাভাবনা, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে উন্নয়নের যে পরিকল্পনা তাঁরা করেছেন, তার বাইরে সরকারী যেসব কাজ হচ্ছে, আবার সমাজবিজ্ঞানীরা যেভাবে ভাবছেন, তাঁদের কাছে তাঁদের উন্নয়নের ব্যাখ্যা আমরা শুনি—সেইজন্যে আমরা এই পত্রিকাটাকে নিয়ে একটা কমোন প্ল্যাটফর্ম তৈরীর চেষ্টা করছি যেখানে সবাই বিভিন্ন বিষয়ে মতামত রাখার চেষ্টা করতে পারেন। সেই বিষয়গুলো প্রাকৃতিক বা সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক হতে পারে। কোনটা স্থায়ী উন্নয়ন, কোনটা অস্থায়ী উন্নয়ন সেসব নিয়েও বহু বিতর্ক আছে। সেইজন্যে সবার ওপিনিয়ন বা মতামতকে একটা প্ল্যাটফর্মে ধরে রাখার দরকার আছে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকদের বক্তব্য পড়ে পাঠকরাও একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারেন, যে তাঁদের আসলে ঠিক কি করা উচিত বা কীভাবে করা উচিত। ক্রিটিক্যাল এ্যানালিসিস কোথাও না কোথাও একটা হওয়া দরকার। এই বইটার মধ্যে পরস্পর বিরোধী কিছু মতামত থাকলেও থাকতে পারে। সবকিছু মিলিয়েই পাঠক তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সেই সব বিষয়ে তথ্যের ঘাটতিও বিভিন্ন লেখায় পূরণের চেষ্টা করা হবে। আমরা যারা কথায় কথায় উন্নয়নের কথা বলি, সেখানে বিভিন্ন মত এবং পথের সমন্বয় সাধনেরও দরকার আছে। সিভিল সোসাইটি অর্গ্যানাইজেসন হিসেবে সবুজ সংঘ গত তিরিশ বছর ধরে নানারকম কাজ নানা জেলায় করছে। সেইসব অভিজ্ঞতার বিনিময় করারও সুযোগ তৈরি হবে। আবার সকলের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যে যতটা সম্ভব সবার অংশগ্রহণটাও পেতে চাইবো। পাঠক যদি এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা পাঠ করে তাঁর বিশ্লেষণ দিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি ঘটান, এবং তা এই পত্রিকার মাধ্যমেই অন্যদের সঙ্গে বিনিময় করেন, তাহলে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

সবুজ সংঘ যেখান থেকে শুরু করে ত্রিশ বছরে যেখানে পৌঁছেছে, সেই পুরো যাত্রাপথের বিভিন্ন ঘটনা বা তথ্যগুলি কোথাও নথিভুক্ত করণের ব্যবস্থা ছিল না। এইরকম নানা উপলব্ধি থেকেই দুহাজার তেইশ সালে এই পত্রিকা শুরু করা হল। যদি আরও অনেক বছর ধরে আমাদের এই উন্নয়নের কাজকর্ম চলে, এই পত্রিকার মধ্যে সেই উন্নয়ন যাত্রার বর্ণনাও ধরা থাকবে ভবিষ্যতের যাত্রীদের জন্য। শুভম্

স্বর্ণলতা সবুজ সেবাসদন

কমিউনিটির মালিকানায় এবং কমিউনিটি দ্বারা পরিচালিত একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ করা হয়।

চব্বিশ ঘন্টা ওপিডি, কুড়িটি ইনডোর বেড, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি অপারেশন থিয়েটার, ফার্মেসী, ছানি অপারেশনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে

গ্রাম এবং পোস্ট : নন্দকুমারপুর
জেলা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন : ৭৪৩৩৪৯
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন ঃ ৭০৬৩৬৭০০৭৬

সম্পাদকীয়

সমাজসেবীরা নিজেরাই মিডিয়া তৈরী করুক

সারা পৃথিবী জুড়ে সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যে কতকগুলি মার্কামারা বিষয়বস্তু আছে যা নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে, গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করতে বাধ্য। যেমন গরীব অসহায় মানুষদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা, পরিবেশ দূষণ কমানো, নারীর ক্ষমতায়ন ঘটানো, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমাজচেতনা জাগিয়ে কুসংস্কার দূর করে তাঁদের আর্থিক দুরবস্থা কাটিয়ে তোলা, দরিদ্র পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল অনাময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ইত্যাদি। এসব কাজ তাঁরা দশকের পর দশক ধরে করেই চলেছেন। কিন্তু শুধু তাঁদের কাজ করাতেই তাঁদের ভূমিকা শেষ হয়ে যাচ্ছে না। এইসব বিষয়ে তাঁদের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনাগুলি নিয়ে সকলকে ভাবিয়ে তোলাটাও তাঁদের আরেকটা কাজ বলে তাঁরা মনে করেন। নিজেরা ভাববো, চর্চা করব, অনুশীলন করব এবং অন্যদেরও ভাবতে শেখাব, এই হল সমাজসেবীর জেদ। সেই জেদের বিষয়গুলি যখন খুব বড় বড় করে ঘোষণা করে প্রকাশ্যে নিয়ে আসার প্রয়োজন হয়, তখন তাঁরা বই প্রত্রিকা প্রকাশ করেন। তথ্য চিত্র তৈরী করেন। মানে নিজেরাই মিডিয়া গড়ে তোলেন। কারণ বাজারি মিডিয়া রাজনীতির কারবারীদের নিয়ে মাতামাতি করে। সিনেমা বায়োস্কোপ, ব্যাটবল খেলা নিয়ে চর্চা করেই তাদের দম ফুরিয়ে ফেলে। তার বেশি এগোতে পারে না। সমাজসেবীদের ভাবনাগুলি, বিষয়গুলি, কথাগুলি নিয়ে সুতরাং চর্চা করতে হলে, তাদের নিজেদেরই চর্চা করার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই ব্যবস্থারই অংশ হিসাবে বিভিন্ন দশকে বিভিন্ন বড় বড় সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বর্তমানকালে সেইসব চর্চার কেন্দ্রগুলি এবং তাদের তৈরী মাধ্যমগুলি হয় দুর্বল হয়েছে অথবা অস্তমিত হয়েছে। সবুজ সংঘ এখনও পশ্চিমবঙ্গে এইসব কাজকর্মগুলো করার ক্ষেত্রে ভাদ্রমাসের দুপুরের সূর্যের মতোন ঝলমল করছে। হিমালয়ের কোলের গ্রামগুলি থেকে বঙ্গোপসাগরের কোলে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে এই সংঘের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। সেই অস্তিত্ব এমনভাবে এতরকম কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে যে, কিছুদিন আগে সমাজসেবীদের এক আড্ডায় শুনলাম, পৃথিবীতে দুটি সংঘই রয়েছে যারা সিরিয়াসলি কাজকর্ম করছে। তারা হচ্ছেন রাষ্ট্রসংঘ, আর সবুজ সংঘ। এই দুটো সংঘই নাকি সবার কাছে পরিচিত। আর সবুজ সংঘ নাকি রাষ্ট্রসংঘ তথা জাতিসংঘের পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করে। যেমন এখন তারা জাতিসংঘের সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট গোল ধরে

ধরে বাস্তবায়ন করছে! কথাগুলো সমাজসেবীদের নিজস্ব আড্ডায় ঠাট্টাচ্ছলে বলা কথা হতে পারে। আবার জনগণের মধ্যে কাজকর্ম করে বিস্তারলাভ করার একটা ইঙ্গিতও এই কথাটির মধ্যে রয়েছে, এমনও হতে পারে। কারণ এই রাজ্যের আটখানা জেলার কয়েক হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ সবুজ সংঘের উপকারভোগির তালিকায় রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে এতটা বিস্তীর্ণ এলাকায় এত বিভিন্ন কাজ যার সবটাই জাতিসংঘের 'সাসটেইনেবেল ডেভেলপমেন্ট গোল' কে মাথায় রেখে প্ল্যান করা হয়েছে, সেরকম খুব বেশী সংগঠন নেই। যদি দ্বিতীয়টা হয়, তাহলে কিন্তু এই ধরনের প্রত্রিকা এবং বই প্রকাশ করা, তথ্যচিত্র তৈরী করা সবুজ সংঘের দায়িত্বের মধ্যে এসে যায়। রাজ্যের রাজধানী সহ সাত আটটি জেলায় কাজের অভিজ্ঞতা কেমন হচ্ছে সেটাও মানুষকে জানানো দরকার। আবার অন্যান্য সমাজসেবী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এসব বিষয়ে কি ভাবছে সেগুলি প্রকাশেরও একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই পত্রিকা সেদিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

পত্রিকার নাম হিসাবে উন্নয়ন কথাটা যথাযথ হয়েছে কিনা সেটা ভবিষ্যতে বোঝা যাবে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে যে 'ডেভেলপমেন্ট' শব্দটার বাংলা অনুবাদ হিসাবে উন্নয়ন শব্দটাই জনগণ বেশি গ্রহণ করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'বিকাশ' শব্দটা হিন্দিতেই জনপ্রিয় হয়েছে, বাংলায় নয়। সারা উত্তর পশ্চিম ভারতের হিন্দি ভাষায় বিকাশ বলতে মানুষ ডেভেলপমেন্ট বুঝিয়ে থাকেন। আমার পশ্চিমবঙ্গে ব্লক ডেভেলপমেন্ট বলতে সমষ্টি উন্নয়ন লেখা হয়। এসব নিয়ে পান্ডিতদের মধ্যে যতই তক্কো হোক, ভাষা মানে, একটা জীবন্ত গতিশীল বিষয়। মানুষের মুখে মুখে যদি ডেভেলপমেন্টের বাংলা হিসেবে উন্নয়ন কথাটা চালু হয়ে যায়, তাহলে সেটা যতই ভুল হোক, অবৈজ্ঞানিক হোক, সেটাই চালু থাকবে। যেমন, 'ফাজিল' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিদ্বান। কিন্তু বাংলায় শব্দটির মানে 'দুষ্টু' বা ঐ জাতীয় কিছু। এক্ষেত্রেও সবুজ সংঘ 'উন্নয়ন' শব্দটি দ্বারা 'ডেভেলপমেন্ট' বোঝাতে চেয়েছে, অন্য কিছু নয়।

আর একটা কথা বলি । পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা পড়ে আপনারা মতামত জানিয়ে আমাদের চিঠি লিখুন। ইংরেজি, বাংলা, যে কোন ভাষায়, সে চিঠি ইমেল, হোয়াটস অ্যাপেও পাঠাতে পারেন, ডাকযোগেও পাঠাতে পারেন। আমরা নিন্দা, প্রশংসা,সমালোচনা সবই গ্রহণ করব। এবং প্রকাশ করব। হোয়াটস্ অ্যাপে লিখলে ৯৮৩০৯৭২১৩৬ নম্বরে লিখবেন। ই-মেইল করলে, director @ sabujsangha.org তে করবেন। পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে জুলাই মাসে। আপনি যে কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে পাঠান। □

জল দূষণ ও পরিবেশ

ড: শ্যামাপ্রসাদ সিংহরায়

সদস্য, সবুজ সংঘ পরিচালন সমিতি

জল পরিবেশের একটি অন্যতম উপাদান। পৃথিবীতে পেয় জলের পরিমাণ তার আয়তনের মাত্র ০.৫ শতাংশ (২.৮৪ ×২০৫ ঘন কিলোমিটার)। সমগ্র বৃষ্টিপাত (তুষারপাত সহ) পৃথিবীতে ৪০০০ ঘন কি.মি., যা বর্ষাকালেই ৩০০০ ঘন কি.মি.।

দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের জন্য গত কয়েক শতকে জলের চাহিদা ভারতবর্ষে অনেকটাই বেড়ে গেছে। ফলে শিল্পায়ন, কৃষিকার্য, নগরায়ন এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ভারতবর্ষের বেশ কিছু জায়গায় জলের গুণগত মানের পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু ভারতবর্ষেই নয় বিশ্বের নানান জায়গায় এই পরিবর্তন ভয়াবহ রূপে দেখা দিচ্ছে। অবশ্যই পেয় জলের সংকুলান কমে যাচ্ছে এবং পরিবেশের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

জল দূষণের প্রকারভেদ ঃ

সাধারণত দুইভাবে জলদূষণ হতে পারে। নির্দিষ্ট কোনও জায়গা, যেমন জলের পাইপ, পেট্রল ট্যাঙ্কার অথবা শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ। অন্যটি হল বিভিন্ন জায়গা, কখনও খনি ইত্যাদির বর্জ্য যা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে অথবা কৃষিকার্যে ব্যবহৃত সার বা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ যা জলের সঙ্গে মিশে অনেকদূর পর্যন্ত দূষণ ঘটাতে পারে।

উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ ঃ

(১) নগরায়ন : নগরায়নের ফলে ফস্‌ফরাস্‌-এর পরিমাণ বেড়ে যায়, কংক্রীটের চাদরে ঢেকে থাকা শহরে বৃষ্টির জল মাটির নীচে যেতে পারে না, ভূ-জলের পরিমাণ কমতে থাকে, শহরের বর্জ্যপদার্থ জলের সঙ্গে মিশে গিয়ে নদীর জল আর ভূ-জলকে ক্রমশই দূষিত করে তোলে। কৃষিকার্যের পর নগরায়নই সর্বাধিক জল দূষণের কারণ।

(২) কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ : এইগুলি যখন জলে মিশে যায়, তখন দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে। ফলে হ্রদ, পুকুর, নদী ও সমুদ্রের জীব বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আসে। মাছ মরে যায়। Algae ও Plankton জলাশয়গুলিতে বাড়তে থাকে সার ও রাসায়নিক পদার্থ যা কৃষিকার্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় তা মাটির উর্বরা শক্তি কমাতে থাকে।

(৩) শিল্পের বর্জ্য পদার্থ : অনেক শিল্প কারখানা নদীর ধারে রয়েছে। কারণ এইসব শিল্পে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন। ইস্পাত , রং কারখানা প্রভৃতির বর্জ্য পদার্থ নদীর ধারে স্তুপাকারে রাখা হয় এবং কালক্রমে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে গিয়ে তা নদীতে

পড়তে থাকে। অ্যালুমিনিয়াম শিল্প থেকে ফ্লোরাইড জলে এবং বাতাসে মিশে যায়। তেমনিভাবে সার কারখানা থেকে অ্যামনিয়া এবং ইস্পাত কারখানা থেকে সায়নাইড নির্গত হয়। চামড়ার কারখানা থেকে ক্রোমিয়াম বর্জ্য পদার্থ হিসেবে বার হয় এবং নিকটবর্তী জলাশয়গুলোতে ক্রোমিয়াম দূষণ ঘটায়।

(৪) কৃষিকার্য ও রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ : সব থেকে বেশি জলদূষণ কৃষিকার্য ও রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ (যা কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়) ঘটাতে সাহায্য করে। কৃষিকার্যে পুরোনো সেচ পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে জল লাগে। বিদ্যুৎ বা অন্যান্য বিষয়ে সরকারী সহায়তায় তা আরও বেড়ে যায়। প্রচুর পরিমাণে ভূজল তোলার ফলে ভূ-জলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। জলে আর্সেনিক, ফ্লোরাইড, ইউরেনিয়াম, আয়রন এর পরিমাণ বাড়তে বাড়তে জলকে অব্যবহারযোগ্য করে তোলে। পশ্চিমবংগে, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে জলে আর্সেনিক দূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। পাঞ্জাবে জলে লবণাক্ততা, ফ্লোরাইড ও ইউরেনিয়াম দূষণ দেখা দিয়েছে। এছাড়া কৃষিকার্যে ব্যবহৃত পেস্টিসাইডস জল-দূষণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

(৫) অন্যান্য : পারমাণবিক ও অন্যান্য শিল্পের গরম তরল বর্জ্য, সমুদ্র তৈল দূষণ, অ্যাসিড বৃষ্টিপাত, অনুশক্তির বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি অসংখ্য কারণে জল-দূষণ ক্রমশই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। হিমবাহ গলতে শুরু করেছে এবং প্রচুর জলের জোগান বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। আবার পরবর্তী সময়ে জলের অপ্রতুলতাও দেখা দিতে পারে।

জলজ দূষণ : মানব শরীর ও জলজ জৈবিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

(১) মানব শরীরে জল দূষণের প্রভাব : অতিমাত্রায় রাসায়নিক পদার্থ যেমন ফ্লোরাইড, আর্সেনিক, সীসা, পারদ, পেস্টিসাইডস, পেট্রোলিয়াম বর্জ্য, নাইট্রেটস মানবশরীরে বিভিন্ন রোগের কারণ হয়। ১.৫ মিলিগ্রাম /লিটার জলে ফ্লোরাইডের মাত্রা হলে শিরদাঁড়া এবং পায়ে বক্রতা তৈরী করে। মানুষ কর্মক্ষমতা হারায়। তাছাড়া দাঁত তাড়াতাড়ি পড়ে যায়। ০.১০ মি.গ্রাম /লিটার হচ্ছে আর্সেনিকের সর্বোচ্চ সহনশীলতা। তার বেশী হলে আর্সেনিকোসিস, গায়ের চামড়ার কর্কট রোগ, যকৃত, মূত্রথলী, ইত্যাদি জায়গায় ক্ষতি করতে পারে। অত্যাধিক মাত্রায় ক্রোমিয়াম, ক্যাডিমিয়াম ও পারদ যদি জলে মিশে থাকে তাহলে সেই জল ব্যবহারে কর্কট রোগ ও অন্যান্য কঠিন রোগের কারণ ঘটায়। এছাড়া জলবাহিত রোগ যেমন টাইফয়েড, ডাইরিয়া, কলেরা প্রভৃতি অনেক সময় মহামারীর আকার ধারণ করতে পারে। মানবশরীরের বর্জপদার্থ জলের সঙ্গে মিশে গেলে তা ভয়াবহ মহামারীর আকার ধারণ করতে পারে।

(২) জল দূষণের কুপ্রভাব গাছপালার ওপর : শিল্পায়ন ও নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে নির্গত গ্যাস বায়ুমন্ডলে পৌঁছে যায় এবং বৃষ্টিপাতের সঙ্গে আবার ভূমি এবং জলাশয়ে

নেমে আসে—জলাশয়ের ph নামিয়ে দিয়ে অম্লতার বৃদ্ধি ঘটায়। গুল্ম-লতাদির বৃদ্ধি সাধনে অনেকটাই ক্ষতি করে। জলাভূমির অণু-খাদ্য কমতে থাকে। যে সমস্ত গাছের মূল খুব একটা গভীরে যায় না, অম্ল জলের প্রভাবে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

কলকারখানা অথবা গৃহস্থ কাজে ব্যবহৃত পরিশোধক জলের সঙ্গে মিশে গিয়ে গাছ-পালার প্রভূত ক্ষতি করে। গাছপালার বৃদ্ধি কমাতে থাকে। কৃষিকার্যের ব্যবহৃত সার, ঔষধ জলের সঙ্গে মিশে গিয়ে অণু-খাদ্যের তারতম্য ঘটায় ও গাছপালার ক্ষতি করে, বৃদ্ধি কমিয়ে দেয়, জমির উর্বরাশক্তি নষ্ট করে। একইভাবে কল-কারখানা বর্জ্য পদার্থ, বিশেষ করে ছাই জলের গুণগত মানে পরিবর্তন আনে, এবং জলজ গাছ-পালার ক্ষতি করে। বন্যায় এবং অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে জলের সঙ্গে ভেসে আসা ছোট ছোট বালুকণা, জলাশয় এবং নদীতে জমতে থাকে। নদীখাত মজে যায়। এবং অনুখাদ্যের অভাবে জলজ গাছ -গাছড়ার ক্ষতি হয়। পেট্রোল ট্যাঙ্কারে ছ্যাঁদা থাকলে পেট্রোল মাটিতে বা সমুদ্রে পড়ে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দেয় বিভিন্ন জলাশয়ে। ফলে জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়। একইভাবে কারখানা থেকে নির্গত গরম জল জলজ উদ্ভিদের ক্ষতি করতে পারে। গরম জলের দূষণে জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে। এবং অনু-খাদ্যের অভাব ঘটায়। রাসায়নিক পদার্থের দূষণে জলের ক্ষতি হয়। বিষাক্ত রাসায়নিক গাছের মূলে জমা হতে থাকে। যার ফলে চারাগাছ, গাছের পাতার ক্ষতি হয় এবং গাছের বৃদ্ধি অনেকটাই কমে যায়। যে সমস্ত গাছ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা আস্তে আস্তে খাদ্য-শৃংখলে পৌঁছে যায় এবং জীব-জন্তু ও মানুষের ক্ষতিসাধন করতে পারে। একইভাবে অধিকমাত্রায় আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড থাকলে জল সেচের সঙ্গে তা ধান বা অন্যান্য খাদ্যে জমতে থাকে। এবং খাদ্য শৃংখলে পৌঁছে গিয়ে মানব সম্পদকে বিপুলভাবে ক্ষতি করতে পারে।

কিভাবে জলদূষণ কমানো যেতে পারে :

আমাদের দেশে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, সুসংহত ভৌমজলের সেচব্যবস্থা, অনিয়ন্ত্রিত ভূ-জল উত্তোলন, পরিশোধনহীন কল-কারখানার কঠিন ও তরল ও বর্জ্য নিষ্কাশন জল-দূষণের বিশেষ কারণ। যদিও এ ব্যাপারে অনেক বিধি নিষেধ বলবৎ আছে। কিন্তু পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অভাবে তা অনেকেই মানেন না। অনেক সময় সরকারী নীতিও এইসব দূষণে সাহায্য করে। ছোট ছোট প্রকল্প নিয়ে জল-দূষণের মোকাবিলা করা উচিত। সরকার এর পক্ষ থেকে সুসংহত জল প্রকল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জনসাধারণকে সর্বোতভাবে সহায়তা করা দরকার। এটা মনে রাখতে হবে, এই দূষণ প্রক্রিয়া এতই ব্যাপক এবং দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে, এখনই এর মোকাবিলা না করতে পারলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা জলদূষণ মুক্ত পরিবেশ রেখে যেতে পারবো না। সর্বশেষে একটাই কথা, জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে এই পরিকল্পনাগুলো রূপায়ণ করতে হবে। তাদের মধ্যে যদি আমরা সচেতনতা তৈরী না করতে পারি, তবে এই পরিকল্পনাগুলোর সার্থক হবার ব্যাপারে প্রশ্নই থেকে যাবে। শুধু আইন করে নয়, সচেতন জনসমাজই পারে এই জল-দূষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা নিতে।□

পৃথিবীতে আদিবাসীরাই পরিবেশ রক্ষা করে চলেছে

শরদিন্দু ব্যানার্জী

বিশিষ্ট সমাজকর্মী শরদিন্দু ব্যানার্জী দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন কাজে যুক্ত আছেন। তিনি 'চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল' এর ভারতীয় সহায়ক সংস্থা 'সহায়' এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বর্তমানে তিনি বহু সংগঠনের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য ও পরামর্শ দাতা হিসেবে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী প্রজন্মের পাথেয় হতে পারে।

পরিবেশ বা ক্লাইমেট চেঞ্জ যাই বলি না কেন, সেটা এখন যেন চোখের সামনেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। সারা পৃথিবী জুড়ে। উত্তর আমেরিকায় এমন তুষার ঝড় হচ্ছে যে পাঁচশো বিমান বাতিল হয়েছে। প্রাইভেট গাড়ি রাস্তায় বের হচ্ছে না। সরকারী গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া আর কোনও গাড়ি বের হচ্ছে না। এরকম একটা উন্নত দেশের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে গরিব দেশে কি ঘটবে? গরিব দেশে এসব খবর বের হয় না। কেউ কমপ্লেন করে না বলে কেউ জানতেও পারে না। অবস্থাপন্ন লোকদের অত্যাচারের জন্য সারা বিশ্বের এই যে অবস্থা, এর একটা বিচার হওয়া দরকার। অনেক মিটিং, আলোচনা হয়, কিন্তু সত্যিকারের সেই ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের মতো ট্রায়াল আর হয় না। ফ্যাসিজিম্-এর একটা চূড়ান্ত দিক বলে আমার মনে হয়। সেগুলো আজ থেকে তো হচ্ছে না। কয়লার যে ব্যবহার, খনিজ পদার্থের অপব্যবহার, যথেচ্ছ ব্যবহার। বিশ্ব যুদ্ধের সময় শেষ দিকে, অ্যাটম বোমাই পড়ল। পরিবেশ তো ইমব্যালেন্স হবেই। যেভাবে পারমানবিক পরীক্ষা হয়েছে। ধরা যাক, পঞ্চাশের পর ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, যেভাবে সাগর বা মরুভূমিতে

পরমাণু পরীক্ষা করেছে তার এফেক্ট আমরা এখন পাচ্ছি।

পরিবেশ ব্যবস্থা আর অর্থনৈতিক দিক ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। যারা, পরিবেশ ধ্বংস করেছে, তারা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হচ্ছে সব জায়গায়। সেটা সর্বত্র দেখা যায়। আমাদের দেশ হোক বা উন্নত দেশ হোক, উন্নয়নশীল বা গরীব যেই হোক, অর্থনৈতিক স্বার্থ থাকলে পরিবেশ ধ্বংস হয়। যেমন, বাংলাদেশে সুন্দরবনে থার্মাল পাওয়ার স্টেশন হবে শুনছি রামপাল এলাকায়। সেটা নিয়ে পারমিশন দিয়েছে। আন্দোলন চলছে, তার বিরুদ্ধে, চর্চা হচ্ছে। এতে তো সর্বনাশ। শুনেছি ভারতের অর্থ সাহায্যে হবে। সুন্দরবনে এতো গাছ কেটে যদি এসব হয়, তাহলে কিন্তু এনভায়রনমেন্টের সর্বনাশ হয়ে যাবে। এত গাছ কেটে রাস্তাঘাট তৈরি করে যদি এসব হয় পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধ্বংসের মূলে কিন্তু অর্থনীতি। লোকেদের ধারণা অনেক চাকরী হবে। আসলে চাকরী থাকবে না। লোকই থাকবে না। জি.পি. এস. সিস্টেম দিয়ে লোক খুঁজতে হবে। ব্যাঘ্র প্রকল্পে যেমন বাঘের গলায় কলার পরিয়ে ট্র্যাক করা হয়। কোকাকোলা, পেপসি কোলা প্রোজেক্ট গুলোতে এনভায়রনমেন্ট নষ্ট করা হয়। কেরালার মতো জায়গায় ওরা এতো জল তুলেছিলো যে কেরালার সেই সব এলাকা ড্রাই হয়ে গেছে। গ্রাউন্ড ওয়াটার তুলে তুলে সেই জায়গাটা মরুভূমির মতো হয়ে যায়। সেটা কী বিজ্ঞানীরা জানে না? জানলেও টাকা খেয়ে এসব অনুমতি দিয়ে দেয়। আর বিচার ব্যবস্থার কথাতো বলাই যাবে না।

আমি বই পড়া বিদ্যে থেকে বলছি না। সারা ভারতবর্ষে কাজ করায় অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যে এলাকায় আদিবাসীরা থাকে, সেখানেই খনিজ পদার্থ সব থেকে বেশী থাকে, জঙ্গলও বেশী থাকে। ওরা কিন্তু পৃথিবীটাকে প্রোটেক্ট করে রেখেছে এই অত্যাচার থেকে। ইনভিজিবল প্রোটেক্টর। আমি জানি না অলমাইটির ইচ্ছায় কি না। তিনি এইভাবে আদিবাসী পাঠিয়ে প্রোটেক্ট করছেন হয়ত। আদিবাসী উচ্ছেদ মানেই সেই প্রোটেকশনটা তুলে দেওয়া। যারা আদিবাসী, তারা জানে যে, এখানে কয়লা পাওয়া যায়, এখানে তামা পাওয়া যায়, এখানে লোহা পাওয়া যায়। কোন গাছ গুলোর কি কাজ। তারা জীবজন্তু বায়োডাইভার্সিটি সব কিছু বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু তাদের উচ্ছেদ করা হয় জঙ্গল সাফ করার জন্য। জঙ্গল সাফ করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার করতে গেলে প্রচুর টাকার লেনদেন হয়, মাফিয়াচক্র চলে আসে। আদিবাসীদের ঠিক মত কম্পেনসেশনও দেয় না। উড়িষ্যায় একটা বিরাট চক্রান্ত চলছে। ঝাড়খন্ডে, ছত্তিসগড়েও একই অবস্থা। আদিবাসীদের করিডরটা মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে নর্থ-ঈস্ট অবধি চলে গেছে। এই এলাকাগুলো ঘুরলেই সেটা দেখা যায়। আমি ঘুরে দেখেছি এনজিওরা প্রচুর কাজ করে, মিশনারীরাও করে। কিন্তু পরিবেশ বাঁচানোর জন্য যে আন্দোলন, সেটা করতে দেওয়া হয় না। করলেই তাদের পয়সার জোরে

এক্সট্রিমিস্ট বলে জেলে পুরে দেবে। তাদের সেই ক্ষমতা অনেক। তাহলেও মানুষকে ভেঙে পড়লে চলবে না। আমেরিকায় কিছুদিন আগেই হয়েছে। সব থেকে অত্যাচারী দেশ তো ওরাই। একটা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হল। গ্যাস এমন ছড়ালো যে গোটা অঞ্চলে পশু পাখি মরে গেল। তার জন্য কেস চলছে। আদিবাসীরা জল, জঙ্গল, জমি সব রক্ষা করে। ধরা যাক বায়ু দূষণ, জল দূষণ, মৃত্তিকার দূষণ, শব্দ দূষণ, দৃশ্য দূষণ, এত কিছুর দূষণ হয়। গাড়ির ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া, পারমাণবিক পরীক্ষা এসবের ফলে বাতাসের দূষণ। এসব বন্ধ করা যাবে কিভাবে? আবার মাঠের জমিতে কীটনাশক, রাসায়নিক সার, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ থেকে জল এবং মৃত্তিকার দূষণ হচ্ছে। বাজি পোড়ালে, মাইক বাজালে, জোরে হর্ণ বাজালে, শব্দ দূষণ হচ্ছে। আমাদের দেশে সব রাজ্যে এবং কেন্দ্রে পরিবেশ দপ্তর আছে, সেখানে টাকা বরাদ্দ আছে, সবই আছে। কোনটি বন্ধ হচ্ছে? আবার এই করোনা যুগে, সব কিছু ডিজিটাল হল। সেখানে প্লাস্টিকের উপর জোর দেওয়া হল। প্লাস্টিকের তৈরি পোশাক পরে বিশ্বজুড়ে চিকিৎসকরা চিকিৎসা করল, প্লাস্টিকের বোতল, থলে এসব কোথায় ফেলবে? তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে থার্মোকল, পরিবেশের জন্য সব থেকে ক্ষতিকর। কাকে পরিবর্তন করা হবে। এসবের সমাধান হচ্ছে, আইন করে প্লাস্টিকের উৎপাদন বন্ধ করা। কিছু বছর আগেও মানুষ প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করত না, ট্রেনে যেতে যেতে স্টেশনে নেমে কুঁজো ভরে নেওয়া হত। প্লাস্টিকের অতি ব্যবহার চলছে। কাগজের ঠোঙা তো উঠেই গেছে। হিমালয়ে গেলে পাহাড়ের নীচে প্লাস্টিকের জঞ্জাল স্তূপ হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। আজকাল ঘরের ফার্নিচার, দরজা সবই প্লাস্টিকের হচ্ছে। রিসাইক্লিং করা হচ্ছে কিছু কিছু। কিন্তু সেসব বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ। প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। গরু, ছাগল খেয়ে ফেলছে প্লাস্টিকের ব্যাগ। তারপর মারা যাচ্ছে। সমুদ্রে ভাসমান প্লাস্টিক খেয়ে সামুদ্রিক প্রাণী মারা যাচ্ছে। প্লাস্টিক আর থার্মোকলের বিরুদ্ধে বড় আন্দোলন দরকার। সরকার একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তারপর সেটা হয়তো নানা কারণে ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে প্লাস্টিকের প্রোডাকশন বন্ধ না হলে হবে না। সে উৎপাদন হবে, মানুষের গণতান্ত্রিক চয়েসের অধিকার থাকবে। তা হলে কি গণতন্ত্রও পরিবেশের শত্রু? অধিক গণতন্ত্র বিশৃঙ্খলা তৈরী করতে পারে? মদ খাবেন, সিগ্রেট খাবেন, সে সব চয়েসের অধিকার থাকবে, সরকার ডিক্টেট করতে পারে না। প্লাস্টিক ব্যবহার করব কি না, সেটাও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়েই ডিবেট, আলোচনা করে প্লাস্টিক উৎপাদন বন্ধ করা উচিত।

জঙ্গল কিন্তু তৈরি করা যায়। শহরেও জঙ্গল তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। পৃথিবীতে পোকামাকড় জীবজন্তু সবাই থাকবে। পৃথিবী তো শুধু মানুষের জন্য নয়।

ইকোলজিকাল ব্যালান্স তখন ফিরে আসবে। গাছ কাটলে গাছ লাগাতে হবে। ওয়েটল্যান্ড বোজানোর দরকার হতে পারে। কিন্তু অন্যত্র ওয়েটল্যান্ড তৈরি করতে হবে। ২টো গাছ কাটলে ৫টা লাগাতে হবে। একটা ব্রিজ তৈরি করতে বা রাস্তা তৈরি করতে হলে গাছ কাটা বা জলাভূমি বোজানো হতে পারে। তার বিকল্প হিসেবে জলাভূমি তৈরি করা বা গাছ লাগানো হচ্ছে কিনা, সিরিয়াসলি দেখতে হবে। গণতান্ত্রিক উপায়েই সব করা যায়। টাকার জোর, ক্ষমতার জোর, সংখ্যার জোরে গণতন্ত্র অস্বীকার করেই এসব করা হয়। এখন অন্য কাজ করতে ইচ্ছা হয় না। পরিবেশের এসব ক্ষতি দেখে মনে হয়, এখন ফার্স্ট প্রায়োরিটি দুটো, এক জেন্ডার ইকুয়ালিটি, আর দ্বিতীয় হচ্ছে পরিবেশ। মহিলারা এগিয়ে আসছেন, অনেক কালই। ভারতীয় মেয়েরা অস্ট্রেলীয় মেয়েদের সাথে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলছে। সেটা মনের জোরে। শরীর স্বাস্থ্য দেখলে দুটো দলের মেয়েদের তুলনা হবে না। ওদের সমসমানের ফিটনেস নেই। আমার এতদিন পরে উপলব্ধি, এই দুটো নিয়েই কাজ করা দরকার। আবার নারী ও প্রকৃতি খুব কাছাকাছি বিষয়। নারী মানে মাতৃত্ব বা ফেমিনিজম্ কোনওটার কথাই বলছি না। মাতৃ রূপেণ সংস্থিতা বলে মা মা করে, একটা ভন্ডামি করা চললো। মেয়ে মেয়ের মতোই থাকুক। শারীরিক সক্ষমতা তৈরি হোক, মানসিক বিকাশ হোক। আর প্রকৃতি নিয়ে কাজ হোক। নারীর যদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে, সেই দেশের জন্মহার কমে। মনে রাখতে হবে, বিয়ের পরেই ধর্ষণ বেশী হয়, বিয়ের আগে অবধি ততোটা হয় না। কটা স্ত্রী চাইবে যে স্বামী রোজ অত্যাচার করুক। মেয়েরা যত শিক্ষিত হচ্ছে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে, সন্তান সংখ্যাও কমছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে বাসস্থান চাই, রোজগার চাই, ফলে জঙ্গল ধ্বংস হবে। পরিবেশ ধ্বংস হবে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এসবের সংযোগ থাকতে পারে। নাও থাকতে পারে। এ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতের অনৈক্য আছে। জনসংখ্যাটা যদি প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত এবং সচেতন হয়, তাহলে তারা পরিবেশ ধ্বংস করবে না বলেও একটা মত চালু আছে। সেরকম জনগণ পথঘাট পরিচ্ছন্ন রাখে। অকারণ হর্ণ বাজায় না, গাছ কাটে না। বরং সুযোগ থাকলে গাছ লাগায়। ভারতের সমস্ত স্কুলের ছেলেমেয়েরা মাসে একটা গাছ লাগিয়ে সেটার যত্ন নিলে ১ বছরের কতো গাছ হবে? জনসংখ্যাকে কাজে লাগিয়েও অনেক কাজ করা যায়। এই সব বিষয় পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। নারীর ক্ষমতায়ণ, পরিবেশ রক্ষা, জনসংখ্যা এসবের মধ্যে শুরু করব কোনটা থেকে বললে, আমি বলব শিক্ষা থেকেই শুরু হতে হবে। আমি বর্ণ পরিচয়, সহজ পাঠের কথা বলছি না। সহজ শিক্ষা, মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষার কথা বলছি। স্কুল থেকেই জঞ্জালটার জন্য আলাদা বিন ব্যবহার করা, গাছাপালা চেনা, পশু পাখি প্রাণীকে ভালবাসতে শেখানোর দরকার। □

দূষণ ঘটছে সামাজিক আর প্রাকৃতিক দুটি পরিবেশেই

অংশুমান দাস

বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং রাজ্য সরকারের সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য শ্রী অংশুমান দাস সবুজ সংঘ প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘ তিনদশকের সেক্রেটারি। তাঁর প্রাণবন্ত নেতৃত্বেই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের একটি ক্লাব আজ এক বিশিষ্ট সমাজসেবী সংগঠন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে যা বর্তমানে রাজ্যের কলকাতা সহ সাতটি জেলায় কয়েকলক্ষ দরিদ্র অসহায় মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক বিকাশ সহ অজস্র প্রকল্প। প্রকল্পগুলিতে আর্থিক সহায়তা করছেন সরকারী, বেসরকারী, বিদেশী বহু প্রতিষ্ঠান। একেবারে বঙ্গোপসাগরের তীরে গঙ্গাসাগর থেকে পাহাড়ের কোলে আলিপুর দুয়ারের কুমারগ্রাম পর্যন্ত আজ এই সংগঠনের বিস্তারলাভ অংশুমান দাসেরই নেতৃত্বে।

পরিবেশ বলতে আমি দুদিক থেকে বুঝি। এক হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ, দ্বিতীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ। তার কারণ 'বেশ' শব্দটার মানে বাসস্থান, আর পরি শব্দের অর্থ সবদিক। তাহলে বাসস্থানের সবদিকটা নিয়ে যদি পরিবেশ হয়, তার মধ্যে সমাজ ও প্রকৃতি দুটোই রয়েছে। সামাজিক পরিবেশ বললে, আমরা পরিবারবদ্ধ মানুষ, পরিবারের নিয়মকানুন, সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা বোঝাবে। একান্নবর্তী পরিবার হলে তার অনেকরকম নিয়ম। পরিবার থাকে একটা কমিউনিটির মধ্যে। সেই কমিউনিটির নিজস্ব নিয়মশৃঙ্খলা থাকে। সেইসব নিয়মশৃঙ্খলা যদি ভেঙে যায়, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যায়, ছোট ছোট পরিবারও সহজে ভেঙে যাচ্ছে, এই নিয়মশৃঙ্খলা গুলো উঠে

যাবার ফলেই। যার যা খুশী করবে। কোথাও নিয়মশৃঙ্খলা থাকবে না এটা কোনও গণতান্ত্রিকতা হতে পারে না। এটাই হচ্ছে সামাজিক দূষণ। আর প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা উঠলে, এখন ক্লাইমেট চেঞ্জের কথাই উঠবে। এই যে কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী বিশাল জনগোষ্ঠী, আপাতত তাদের ক্ষতিটা খুব বেশী চোখে পড়ছে। বর্ষার যেসময় জল হবার কথা, সেসময় অনেক কম হচ্ছে। যে সময় শীতকাল হবার কথা ঠিকমত সেগুলো হচ্ছে না। ঋতুপরিবর্তনের সময় বদলে যাচ্ছে। এই সামাজিক আর প্রাকৃতিক দুটি পরিবেশেই আজ থেকে কুড়ি বছর আগে যা ছিল, তার থেকে অনেক তফাৎ দেখতে পাচ্ছি। এই তফাতের মধ্যে ভালর থেকে খারাপ বেশী হয়েছে। সামাজিক পরিবেশে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে। কমিউনিটিতে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমছে। এই ডিজিটালাইজেসনের যুগে খুব বেশী অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ব্যবহার আমাদের মধ্যে কনজিউমারিজিম বাড়িয়ে সামগ্রিকভাবে জীবনে এবং সামাজিক পরিবেশটাকে একদম ডিস্টার্ব করে দিচ্ছে বলেই আমার ধারণা। এটাকে ফেরত পেতে গেলে জানিনা কি করা দরকার। এই কনজিউমারিজিম বা ভোগবাদ এমন স্তর অবধি চলে যাচ্ছে, এটাকে থামানো যাচ্ছে না। রাষ্ট্র উদ্যোগ নিলে বা অন্য কোনভাবে কী হবে, আমরা জানিনা সেটা থামানো যাবে কতোটা। ছেলেমেয়েদের আজকাল লেখাপড়ার যে ধরন, যে স্টাইল, সবকিছুই তো বদলে গেছে। ফলে রিকভার করা আদৌ কতটা সম্ভব সে বিষয়ে আমার সন্দেহ থাকছে। কিন্তু আমি সম্পূর্ণটাই নেগেটিভ বলছি না। পজিটিভ বিষয় অনেক আছে। কিন্তু অ্যান্ড্রয়েডের ব্যবহার, হোয়াটস অ্যাপ নামে যে বস্তুটি এসেছে, আজ থেকে দশবারো বছর আগেও এই জিনিসটা ছিল না। এই সোশ্যাল মিডিয়া, এগুলো আমাদের নানাভাবে ডিস্টার্ব করছে। আবার এটারও পজিটিভ দিক আছে। হয়ত একটা জেনারেসনে গিয়ে এই ক্ষতিগুলো মানুষ উপলব্ধি করবে এবং পরের জেনারসেনকে সচেতন করবে।

কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে। মানুষের লোভ সবুজ ধ্বংস করে দিচ্ছে, ইট কাঠ পাথরে ভরে উঠছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। 'কনস্ট্রাকশন' যেন শেষ হবে না কোনদিন। চলতেই থাকবে। বাতাসে ভেসে বেড়াবে ধুলো। ধান, গম কাটার পরে তার গোড়া পুড়িয়ে ধোঁয়া তৈরী করে, বাতাসকে ধুলো আর ধোঁয়াতে এমন করে দেব যে কেউ যেন নিঃশ্বাস নিতে না পারে। জানি না, এটাকে জনসংখ্যা কমানোর একটা পদ্ধতি হিসেবে হয়ত আমরা ভেবে নিয়েছি। নাহলে এসব বন্ধ করতে পারছি না, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। বাতাস আর জল যদি দূষিত করে দেওয়া যায়, তাহলেই খুব দ্রুত জনসংখ্যা কমে যাবে। সুতরাং সচেতনভাবেই দূষণ বাড়তে দিচ্ছি এমনও হতে পারে। কারণ জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকল্প আর এই দূষণ বাড়িয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, মোটামুটি একরকম ফল দান করবে।

অতএব? সুতরাং জনগণকেই বিষয়টা ভাবতে হবে নিজের স্বার্থে। আমরা যারা বড়লোক আমাদের এয়ারকন্ডিশন ছাড়া ঘুম হয় না। এয়ারকন্ডিশন গাড়ি ব্যবহার করছি। কলকারখানা থেকে নিঃসৃত কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশকে নষ্ট করছে। সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মিকে রোধ করার জন্য যে ওজোন গ্যাসের স্তর, সেই স্তর নষ্ট হবার ফলে সূর্যের আলোটাও এখন প্রাণীজগতের ক্ষতি করছে। এই সব কিছুর ফল হিসাবে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে। আমাদের এইসব বিষয়ে আরও সচেতন থাকতে হবে।

দুটো বিষয় ঘটছে এইসব বিষয়ের ফলে। এক হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস। মাস প্রোডাকশন করে বেশী লাভ করতে গিয়ে পরিবেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। রাসায়নিক সার বিষ দিয়েই মাস প্রোডাকশন হয়। ফলে তার প্রভাব শুধু পরিবেশে নয়, আমাদের শরীর স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করছে। এ বিষয়ে কর্পোরেট থেকে শুরু করে আমরা অনেকেই সচেতন হয়েছি বলে দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটছে। এখন জঙ্গল তৈরি করা হচ্ছে। সামাজিক বনসৃজন চলছে। গাছ কেটে, জঙ্গল নষ্ট করে কিছু মানুষ কংক্রিটের জঙ্গল গড়ছে। আবার কিছু কর্পোরেট সোশ্যাল ফরেস্ট্রী, ম্যানগ্রোভ লাগিয়ে এটা ব্যালেন্স করারও চেষ্টা করছে। ব্যালেন্স কতটা হবে, সেটা যারা এ নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা বলতে পারবেন। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে প্রাকৃতিক পরিবর্তনটা খুব ভাল ভাবেই আমার খুব চোখে পড়ছে। যেমন আগেই বলেছি, বর্ষায় বৃষ্টি কমেছে, শীতকালে শীত কমছে। মনে হয় ছয়টা যে ঋতুর কথা বলা হয়, সেই ঋতুর মাস গুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। গ্রীষ্মকাল যখন হবার কথা, তখন অন্য কোন কাল হয়ত এসে যাবে। এখন এ বিষয়ে অনেক গবেষণা চলতে পারে। কিন্তু আমরা সচেতন না হলে এসবের প্রভাব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পড়বেই। আমাদের জেনারশেন যদিও বা মানিয়ে নিয়ে কাটাতে পারি, পরের প্রজন্ম মানে যাদের বয়স এখন এক বা দুই বছর বা যারা পৃথিবীতে আরও পরে আসবে, তাদের জন্য একটা ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে একটা সমাধান সূত্র বের হতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কোন সমাধান সূত্র জানা নেই। একটাই কথা বলা যায়। মানুষের অভ্যাস কিছু কিছু বদলাতে হতে পারে। লোভটা কমাতে হবে। লোভটা অনেক বেড়ে গেছে। সেখানে একটা সীমাবদ্ধতা দরকার। গাছ লাগানো বাড়াতে হবে। রিনিউয়েবল এনার্জির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

বিশ্ব ব্যবস্থার দুটো প্রধান দিক। একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবস্থা। এ দুটোর মধ্যে প্রথমটা মানুষের তৈরি। দ্বিতীয়টি প্রকৃতির তৈরি। এ দুটোর মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বিরাজমান। জীবনযাত্রার মান কেমন হবে সেটা অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কোন ধরনের ঘরে থাকব, কোন

ধরনের গাড়ি ব্যবহার করব সেসব নির্ভর করে মানুষের অর্থনীতির উপর। আর সেটা প্রকৃতিকে কতটা এফেক্ট করছে, যখন ভোগ করি, প্রকৃতির কথাটা মাথায় থাকে না। যাদের অর্থনৈতিক সঙ্গতি নেই, ভোগ করতে পারে না, তারাই প্রকৃতির নেগেটিভ এফেক্টটা কিন্তু ভোগ করছে। বিজ্ঞানীরা তো বলেন, একটা মোটর গাড়ি ১০০ কি.মি. চললে একটা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় এক বছরের অক্সজেন পুড়িয়ে ফেলে। তাহলে কি আমরা গাড়ি চড়বো না? আমরা সবাই গরুর গাড়ির যুগে ফেরত যাবো? সেটাও নয়। অপ্রয়োজনীয় ভোগটা বন্ধ করতে হবে। একটা পরিবারে হয়ত পাঁচখানা গাড়ি। হয়তো পাঁচজনের পরিবারে দশটা মোবাইল ফোন। তিনটে লোকের পরিবারের জন্যে ছয়টা গাড়ি। দিল্লী, বম্বেতে গেলে মনে হয় মানুষের চেয়ে গাড়ির সংখ্যা বেশী। একটা পরিবার থেকে আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছে নেমন্তন্ন খেতে, তিনজন তিনখানা গাড়িতে চড়ে। তার তো কোন দরকার নেই। তাই গরুর গাড়ি চড়ব না। কিন্তু অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ছাড়তে হবে। একজন তথাকথিত ভি আই পির সঙ্গে অনেকগুলো গাড়ি যায়। বুঝি না ওনাদের এতগুলো গাড়ি দিয়ে নিরাপত্তা দিতে হয় কেন? খুব ভয় থাকলে একই গাড়িতে দুজন কম্যান্ডো রেখে দিলেই মিটে যায়। এটা কি ঠাট বাট দেখানোর জন্যে বেশী বেশী গাড়ি দেওয়া হয়? ১৫ টা গাড়ি দিয়ে যে নিরাপত্তা হয়, সেটা দুজন কম্যান্ডো দিয়েও হতে পারে। এভাবে বিকল্প ব্যবস্থাগুলো নিয়ে ভাবা দরকার। নেতারাই পথ দেখাতে পারেন। টোটাল রিসোর্সের বেশী অংশটা মাত্র কতকগুলি লোকের হাতে রয়েছে। ফলে ১৪০কোটি মানুষের দেশে ২৮০ কোটি গাড়ি আছে তা নয়। কিন্তু একটা শ্রেণীর লোকের হাতে অর্থটার কেন্দ্রীভবন হয়ে আছে। কতটা আমার নিজের প্রয়োজন সেটা করব নাকি অন্যের প্রয়োজনে করব সেটা ভাবতে হবে।

'রিসাইকেল' নামে একটি বিষয় আছে। মানে একই জিনিস নানাভাবে বারংবার ব্যবহার যাতে করা যায়। ধরা যাক, জলের ব্যবহার। কেন্দ্রীয় সরকার জলজীবন মিশন প্রকল্পে এখন বাড়ি বাড়ি জল সাপ্লাই করছেন। গ্রামের লোক পুকুর আর টিউবয়েল ব্যবহারেই অভ্যস্ত। সে কলের জলটা ব্যবহার করলে বাড়তি জলটা , মানে ব্যবহৃত জলটা যাবে কোথায়? সে পুকুরে স্নান করত। জল নষ্ট হতো না। কলের জল তো স্নানে নষ্ট হয়। এই জলটাকে এবং রান্নাঘরে ব্যবহৃত জলটাকে যদি রিসাইকেল করে তার কিচেন গার্ডেনে ব্যবহার করানো যায় ভালো হবে। সেভাবে গ্রামের বাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ করে রিসাইকেল করা সম্ভব। প্লাস্টিক রিসাইকেল নিয়েও অনেকে ভাবছেন।প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য বিজ্ঞানীরা বলছেন। করোনা যুগে এটা কিছুটা বেড়েছিল। কিন্তু সেটা একটা অতিমারী পরিস্থিতিতে, জরুরী প্রয়োজনে। এই অতিমারী পরিস্থিতি মানুষের তৈরি কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক

আছে। অনেকেই বলেন করোনা পরিস্থিতি মানুষেরই সৃষ্টি। এখান থেকে বের হবার জন্যে আমরা কিছু জিনিস ব্যবহার করেছি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে প্লাস্টিক ব্যবহার করছি সেটা যত মাইক্রন হবার কথা, ঠিক তত মাইক্রন কিনা, সেটাতে সচেতন থাকতে হবে। মানুষের সেই ব্যবসা করার জন্য, লোভ মেটানোর জন্য, বেশী লাভ করার জন্য এরকম সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলো ভেবেও দেখে না। সেখানে ল-অ্যান্ড -অর্ডারের সমস্যাও যুক্ত। উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষা ঠিক মত থাকার ফলে তাদের সচেতনতা অনেক বেশী। তাদের সচেতনতার স্তর বেশী। আর আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ওই প্লাস্টিকের ব্যাগ কত মাইক্রন হতে হবে, কোনটা ব্যবহার করা উচিত, কোনটা উচিত নয়, আমরা জানিই না। ব্যবসায়ী তার লাভের জন্য সেটা উৎপাদন করতেই পারে। আমি সেটা ব্যবহার করব কি করব না সেটা আমাদের সচেতনতার উপর নির্ভর করে। প্লাস্টিক ধ্বংস হয় না। প্লাস্টিক যদি মাটি চাপা পড়ে যায়, দুশো বছরেও সেটা মাটিতে মিশবে না। শেষ পর্যন্ত সেটা কৃষিকে এফেক্ট করবে, মাটির তলার জলভাণ্ডার রিচার্জ হতে দেবে না, কনস্ট্রাকশনে এফেক্ট করবে। আমরা হয়ত এখনি টের পাচ্ছি না। কিন্তু ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার আধারগুলিকে এফেক্ট করবে। করোনা যুগে আমরা কেয়ারফুল ছিলাম। সে গুলো নষ্ট করা হয়েছে সঠিক পদ্ধতিতেই। কোথাও কোথাও হয়ত হয়নি। কিন্তু সে ছিল দুর্যোগের সময়। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সরকারের যে রেগুলেশন, আমরা সবাই যদি সেগুলোকে মেনে চলি, তাহলে হয়ত এসব বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। □

কিশলয় শিশু শিক্ষানিকেতন

সুসংহত সুশিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান

এখানে শিশুদের লেখাপড়ার সঙ্গে শারীরিক, মানসিক এবং কারিগরি দক্ষতা বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে।

যোগাযোগ ঃ গ্রাম এবং পোস্ট : নন্দকুমারপুর
জেলা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন : ৭৪৩৩৪৯
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন ঃ ৯৭৩২৭৮৫০৩৬

সভ্যতাকে একটু থমকে দাঁড়াতে হবে

ড: অমিতাভ চৌধুরী

চিকিৎসক অমিতাভ চৌধুরী শুধু সুন্দরবনের দ্বীপেই জীবন কাটিয়ে দিলেন গরীব মানুষের চিকিৎসা করে। গত ২৫ বছর ধরেই তিনি গরীবের চিকিৎসক। বাংলায় প্রেসক্রিপশন লেখেন। তিনি প্রেসক্রিপশন বিক্রি করেন না। বিশিষ্ট সাহিত্যিক অমিতাভ ঘোষের উপন্যাসেও নাম পাওয়া যায় এই চিকিৎসকের। কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সিনিয়র অফিসারদের একটি দল সুন্দরবনে এসেছিলেন এবং নির্দ্ধারিত গঙ্গাসাগরে না গিয়ে গোসাবায় গিয়েছিলেন শুধু এই কিংবদন্তী চিকিৎসককে দেখতে। তিনি বর্তমানে সুন্দরবনের সংগঠন সবুজ সংঘের কর্মী। কি বলছেন অমিতাভ পরিবেশ নিয়ে? তাঁর মতে 'লাউডনেস' যাবতীয় সমস্যার জন্য দায়ী? কী ভাবে?

দুটো ঘটনা একজন চিকিৎসক হিসাবে প্রথমেই বলব। মাত্র কিছুদিন আগেই ঘটেছে। একজন অসুস্থ মানুষ আমার কাছে এলেন চিকিৎসার জন্য। বললেন, আমার খুব কষ্ট। বললাম, কি কষ্ট? উনি বললেন, ওনার কি কষ্ট? বললাম কবে থেকে হচ্ছে? বললেন এতদিন থেকে। চিকিৎসা কি করেছেন? তিনি অনেক কাগজপত্র বের করে দিলেন। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট, বিভিন্ন ডাক্তারি কাগজ, সেখানে গ্রামের ডাক্তার থেকে শুরু করে কলকাতার ডাক্তার সবাই আছেন। তখন তাঁকে লাইফস্টাইল পরিবর্তন করার বিষয়ে বললাম। তিনি কি খাবার খান,

কখন খাবার খান, কখন টয়লেটে যান, নেশা করেন কি না? তিনি সব বললেন। জানলাম তিনি খাওয়া দাওয়া ঠিকমত করেন না, বা যা তিনি খান, সেগুলো না খেলেও চলত। টাইমেরও ঠিক থাকে না। কারণ যখন খাবার খান তখন সময়টা হজম হবার পক্ষে উপযুক্ত সময় নয়। বললাম, আপনার বয়স হয়েছে, ৬৫ বছর বয়স। বললাম, সিগারেট বিড়ি দীর্ঘদিন খেলে হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট হয় জানেন তো? তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। তিনি এটাও জানেন, যে, রাত এগারটায় চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছেন আড্ডা দিচ্ছেন, রাত ১২টায় বাড়ি ফিরে খাবার খাচ্ছেন, এটা ঠিক নয়। উনি বললেন, হ্যাঁ জানি যে ওগুলো ঠিক নয়। ফলে দেখা গেল, তিনি তার কষ্টের কারণগুলো সবই জানেন। কিছুই জানেন না, এমন নয়। তখন আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আপনার রোগের কারণটা আপনি জানেন, সমাধানটাও আপনার কাছেই রয়েছে। ডাক্তারের কাছে নয়। তাও জানেন। তাহলে কেন পাড়ার ডাক্তার, সরকারী হসপিটালের ডাক্তার, কলকাতার ডাক্তার, প্রাইভেট হাসপাতাল, ভেলোর ঘুরে আমার কাছে এসে চারঘন্টা বসে আছেন টিকিট কেটে লাইন দিয়ে। তখন তিনি ক্যাবলা ক্যাবলা ভাবে হাসলেন। উত্তর নেই। বললাম, আর নতুন কিছুই বলার নেই। এগুলো করা যাবে, এগুলো করা যাবে না, ব্যাস। দ্বিতীয় ঘটনাটা আমার নিজের বাচ্চাকে নিয়ে গতকাল ঘটেছে। তাকে বললাম, তুই এই চ্যাপ্টারটা পড়, তোর তো কালকে পরীক্ষা, এই চ্যাপ্টারটা পড় আমি এক ঘন্টা পরে এসে পড়া ধরবো। একঘন্টা পরে এসে বললাম পড়েছিস? বলল, হ্যাঁ। প্রশ্ন করব? বলল হ্যাঁ। আমি ওই চ্যাপ্টারের প্রথম প্যারাগ্রাফের একটি জিনিস লেখা আছে। বললাম অমুকটা কি? বলতে পারল না। বানিয়ে বানিয়ে ভুলভাল বলে যাচ্ছে। বললাম এগুলো পড়েছিস? বলল হ্যাঁ পড়েছি। তাহলে প্রথম প্যারাগ্রাফের প্রথম বাক্যটাই তুই জানিস না। এটা কি করে হয়? তারপর সে খুব রেগে গেলো। কান্নাকাটি করল। রাতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন এরকম হল? ও বলল তুমি চলে গেলে আমার মনে হল পরে পড়ব, একটু গান শুনি। ভাবলাম এবার একটু পড়ি। কিন্তু দেখলাম মন বসছে না। তুমি পড়া ধরবে, তখন যদি না পারি, এরকম নানা কথা ভাবতে ভাবতে বন্ধুদের সঙ্গে একটু ফোন টোন করে নিলাম। তারপর আর পড়া করতে পারিনি। আমি বললাম, তুই পুরোটাই জানিস। কেন তুই পড়া পারলি না? কালকে তোর এই সাবজেক্টে পরীক্ষা সেটাও জানিস। কিন্তু তুই করলি না।

আসলে সমাজ বা প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটছে সেগুলো কারোর অজানা কারণে কিছুই ঘটছে না। কারণগুলো সবাই জানে। আমি ভাগ ভাগ করে যদি বলি, পরিবেশ দূষণ, তার মধ্যে বায়ুদূষণ, জল দূষণ, মাটি দূষণ, শব্দ দূষণ, সাংস্কৃতিক দূষণ, এরকম যদি দশটা বিষয় হয়, প্রতিটা নিয়েই দশখানা রচনা লেখা যায়। যদি বলা হয়

'আর্থসামিট' করতে হবে, করে দেব। কখনও রিওডিজেনেরিও কখনো কিওটো প্রোটোকল, বিভিন্ন দেশে বছর বছর আমরা বৈঠক করতে পারি, কিন্তু মূল জিনিস কি পাল্টাবে? পাল্টাচ্ছে না, পাল্টানোর কথাই নয়। মানুষ পাল্টায় না তার এ্যাটিটিউড পাল্টাবে না, লোভ পাল্টাচ্ছে না, অন্তর্দৃষ্টি তৈরী হয় না। যখন আমি সমানভাবে মানুষের কথা বলি, মানে মানুষের তো অনেকগুলো দিক। যখন ধরা যাক সে একা, বা তার ভালোলাগা বিষয়ের মধ্যে সে রয়েছে, তখন সে অন্যরকম। কিন্তু তার সামাজিক আচরণ? সে হয়তো একটা কর্পোরেটে চাকরী করে সেখানে তার যে কাজের পরিবেশ, তার কাছে তার কোম্পানির যেসব দাবী, তার কাছে সাফল্য বলতে যা বোঝায়, সেটা সেই ব্যক্তি মানুষের পছন্দ অপছন্দের ঊর্ধ্বে। সে জানে যে সামাজিক ভাবে সফল হওয়া মানে পাওয়ারফুল হওয়া, বিগ হওয়া। এই পাওয়ারফুল আর বিগ এর সঙ্গে সঙ্গে আসে 'লাউডনেস'। তাকে লাউড হতে হবে। আমি সাইকেল চালিয়ে অফিসে যেতেই পারি। কিন্তু আমাকে মার্সিডিজ চালিয়ে যেতে হবে। কারণ ওর মধ্যে লাউডনেস আছে। এই 'লাউড' শব্দটাকে ভালো করে বুঝতে হবে। খুব বেশি রংচং দেওয়া ক্যাটকেটে রঙের কিছু দেখলে আমরা বলি খুব 'লাউড'। আবার অকারণ প্রচন্ড শব্দ করে মোটর সাইকেল চালাচ্ছে ইতরব্যক্তির মত। সেটাও লাউড। খুব জোরে অসভ্য অশিক্ষিতের মতো চিৎকার করে কথা বললেও আমরা বলি 'লাউড'। আসলে 'লাউড' কথাটা অনেকেই শিক্ষাহীনের সংস্কৃতি বিহীন লোকেদের অসভ্যতা বলেই মনে করেন। তার মধ্যে চিৎকার করা থেকে কড়া রং চং, ইতরামি থেকে আনসিভিলাইজড আচরণ সবই পড়বে। এই শব্দকে বাংলায় কি বলা হবে জানি না। এই লাউডনেস বোঝাতে গত সপ্তাহে সুন্দরবনের একটা ঘটনা বলি। গত পঁচিশ বছর সুন্দরবনেই চিকিৎসা করছি। গত সপ্তাহে ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে চারদিকে সাউন্ডবক্স বাজাচ্ছে। ভোরবেলা হরিনাম সংকীর্তন, রাত্রিবেলায় 'ছাঁইয়া ছাঁইয়া' দিয়ে শেষ হবে। বা কোন গান নেই শুধু দুম দুম দুমুদুম শব্দ করা হবে। কী হচ্ছে এটা? বলল, এটা পঞ্চম দোল। সেটা কী? বলল, দোলের পরে পঞ্চম দিনে আরেকটা দোল। বললাম এটা কবে থেকে চালু হল? বলল, এই গত দু বছর চালু হয়েছে। এই হচ্ছে লাউডের উদাহরণ। পাড়ার উঠতি যুবক, যে জেনে গেছে যে সে অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। সে একটি ছাগল। কিন্তু যখন সে দলবদ্ধ হচ্ছে, তখন সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তার বিক্রম কত? তার প্রকাশ হবে লাউনেস দিয়ে। তার প্রকাশ হবে কতগুলো সাউন্ড বক্স বাজছে তাই দিয়ে। যতগুলো ডিজে দিয়ে যত ডেসিবেল বাজিয়ে মানুষের রাতের ঘুম দিনের শান্তি কেড়ে নিতে পারি, রাস্তা আটকে যানবাহন আটকে, দলবেঁধে চাঁদা তুলছি, এইসবই লাউডনেস। নিজেদের ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাচ্ছি। লোককে দেখাচ্ছি আমার

ক্ষমতা। এই ক্ষমতার প্রকাশ বিষয়টাও বুঝতে হবে। এটাই রাষ্ট্রের সঙ্গে আরেকটা রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে যখন কথা হবে, তখনও সেই লাউডনেসটা থাকে। পাওয়ার এবং তার লাউডনেস। ক্ষমতাকে জাহির না করার শিক্ষাটা উঠে গেছে। কোম্পানীর সাথে কোম্পানীর, একটা সংস্থার সাথে আরেকটা সংস্থার সেখানে ক্ষমতা জাহির করা হয়। কোনো কারণে পাওয়ার এবং তার লাউডনেস এটাতে মানুষের এ্যাডিকসন বা আসক্তি জন্মেছে। তার বাইরে আর কিছুই ভাবতে পারছে না। এর বাইরে কিছু সে ভাবতেই পারছে না। এর বাইরের ভাবনাকে সে মনে করছে অপ্রাসঙ্গিক বাতুলতা, পাগলামি। মানে পরিবেশ দূষণ নিয়ে কাউকে কিছু যদি বলতে বলা হয়, সে পরিবেশকে আরো দূষিত করে আরো দশখানা সাউন্ড বক্স বাজিয়ে, চারটে ডিজে বাজিয়ে বলবে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে আমরা প্রচার করছি। এই লাউডনেসের বাইরে সে কিছু জানে না। মাঠে ধান হচ্ছে, আমার আরও ধান চাই, আমার মাঠে ধান হচ্ছিল, আমি ওটাকে চিংড়ি মাছের ফিশারি বানাবো। তাতে প্রতি একরে আমার লাভ অনেক বেশি। ব্যাঙ্ক থেকে লোন করতে হবে, অনেক মেশিন, অনেক আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। বাইরে চিংড়িমাছ বিক্রি করে যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। তার জন্যে রাত জেগে পাহারা দিতে হবে। গোটা পরিবারের রাতের ঘুম বিঘ্ন হবে। গোটা পরিবার নিয়ে একবছর দুবছর পাঁচবছর ভয়ঙ্কর রাত জাগবো, অনিয়মিত খাওয়া দাওয়া করব, ভয়ঙ্কর অনিয়মিত জীবন যাপন করব, যাতে আমার একটা প্রকান্ড মার্বেল বসানো বাড়ি হয়। এটাই হচ্ছে লাউডনেস। যে করে হোক আমাকে একটা সরকারী কেরানীর চাকরী পেতে হবে। তার জন্য জমি বিক্রি করে, ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে কোন নেতাকে ঘুষ দিতে হবে। চাকরী পেয়ে কী করতে হবে? আমার ভোগটা বাড়াতে হবে। আগে আমার দশজনের পরিবারে মাসে এক লিটার তেল লাগতো, এখন পাঁচজনের পরিবারে মাসে দশ লিটার তেল খেতে হবে। আগে বছরে দুদিন মাংস খেতাম এখন সপ্তাহে তিনদিন মাংস খাবো। আগে বাড়িতে আত্মীয় কুটুম এলে সরবৎ খেতে দিতাম, এখন হুইস্কি দিতে হবে। সাফল্য মানে পাওয়ার, পাওয়ার মানে লাউডনেস। এটা কোম্পানী করে, রাষ্ট্র করে, সংস্থা করে। পাড়ার ক্লাব করে, পরিবার করে। আমরা ছেলেমেয়েকে তথাকথিত মানুষ করতে চাই মানে আরো পাওয়ারফুল, আরো লাউড করতে চাই। তারপরেও যদি আশা করি যে পৃথিবীর জল, বাতাস, মাটি পবিত্র থাকবে! তাহলে সেই আশাটা হচ্ছে সোনার পাথরবাটি।

আমরা দেখলাম, যে প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা খুব লাউড, করোনা যুগে প্লাস্টিকের ব্যবহারও লাউড হয়ে উঠেছিলো। মিডিয়াকে দেখা যাচ্ছে যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে বাকী ইউরোপের দেশগুলো ঘর গরম করার জন্যে কয়লা আর কাঠ পোড়াচ্ছে। তাদের প্রয়োজনেই এ নিয়ে নাকি লাউড হচ্ছে। এতদিন ওরাতো ভারত

আর চীনের কয়লা ব্যবহারের বিরুদ্ধেই ছিল। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তারা কয়লা পোড়ানোর বিরুদ্ধেই বলেছে। আর এখন মিডিয়া প্রচার করছে, তারা নিজেরাই উল্টো কাজ করছে।

আসলে করোনা যুগে যা-যা হয়েছে, তার সবকিছু যে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োজন ছিল তা নয়। সেই অদ্ভুত প্লাস্টিকের পোষাকগুলো যখন বাজারে এলো তখন একেকটা জামা বারো থেকে চোদ্দ হাজারে বিক্রি হয়েছে। পরে মার্কেটে প্রফিট নিয়ে ওই জামা ছয়শো টাকায় বিক্রি হতো। করোনার সময় যাদের করোনা সেরে গেছে, তাদের রক্ত থেকে প্লাজমা বের করে সেখান থেকে যে অ্যান্টিবডি আছে সেটা অন্যমানুষকে যদি দেওয়া যায়, কোভিড আক্রান্ত রোগীকে। সেটা নিয়ে কিন্তু আর প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। কারণটা খুব সঙ্গত। অনেক অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধ আছে, বা কোভিডের ভ্যাকসিন আছে, তাদের মার্কেট অনেক বেশী সংগঠিত। মার্কেটের প্রয়োজন বোঝানোটা মিডিয়ারও দায়িত্ব ছিল। লাইফ সাপোর্টে যেসব রোগী ছিল তার শ্বাসকষ্ট, তাকে মেসিন দিয়ে শ্বাস চালু রাখা হচ্ছে। আই সি ইউ, আই টি ইউ ট্রেনিং পাওয়া লোক যৎসামান্য ছিল। কোভিড আসার পরে দেখা গেল পাড়ায় পাড়ায় আই সি ইউ বা আই টি ইউ বা প্রচুর ভেন্টিলেটার মেশিন চালু হয়ে গেল। প্রচুর পেশেন্ট ভর্তি হল। বহু লোক মারা গেল। এসব নিয়ে কোন ইনভেস্টিগেশন হয়েছে কিনা জানা নেই, যে মিসম্যানেজমেন্টের জন্যে কতজন মারা গেছে। একটা পেশেন্ট যখন পুরোপুরি মেশিনের উপর নির্ভর করে বেঁচে রয়েছে, তখন তার রক্তের পি এইচ নিয়ন্ত্রণ করা, তার ইলেকট্রোলাইট মনিটর করা এসব কতটা হয়েছে? ভারতীয় ল্যাবগুলো এসব নিয়ে খুব পিছিয়ে রয়েছে। হঠাৎ কোভিডের সময় এত আই সি ইউ, আই টি ইউ তৈরী হল, ভেন্টিলেটারে পেশেন্ট রইলো, কতলোক মারা গেল, এর কোন অ্যাকাউন্টিং হয়নি। মহামারী এর আগেও এসেছে। মহামারী যে এই প্রথম, তা নয়। অতীতে প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী হয়েছে। আমার ধারণা অন্য মহামারী গুলোতে কর্পোরেট ইন্টারেস্ট বলে কোন প্রিডমিনেন্ট ফ্যাক্টর ছিল না। কোভিডের সময় মানুষ সবথেকে অসহায় হয়ে গেছিলো। কোভিড প্রাকৃতিক মহামারী অথবা মানুষেরই তৈরী মহামারী যাই হোক। এর পুরো সময়টাতে কর্পোরেট এ্যাবসলিউট ডমিনেট করে বেরিয়ে গেছে। এই কর্পোরেটের যে লাউডনেস, তার শাখা প্রশাখা, তা নিয়ে ভাবা যাবে না। অনেক দূর পর্যন্ত সেটা বিস্তৃত।

ইউরোপ নাকি কয়লা ব্যবহার করছে। সেসব মিডিয়া নির্ভর খবর। মিডিয়া এখনো নিরপেক্ষ নয় সেটা সকলেই জানে। আমি জানি না সত্যি সত্যি ইউক্রেন যুদ্ধের জান্য ইউরোপে তেলের ক্রাইসিস হবে কেন? সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাদের এ্যাকসেসের মধ্যে বহু তেল ভান্ডার আছে। ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রেখেছে। কোন একটা শহরে কোন একদিন কয়লা বেশি পুড়লে সেটা এমনভাবে মিডিয়া তুলে

ধরবে, এত লাউড হবে সেটা নিয়ে, যেন ইউরোপের পুরো শীতকালটা শুধু কয়লাই পুড়েছে মনে হবে। এটার বিষয় আমি বিশদ জানি না।

নতুন কয়লাখনি যেখানে যেখানে আবিষ্কার হচ্ছে, তার চারপাশে পাথর খাদান। আদিবাসীরা সেসব জায়গায় বসবাস করে কাজকর্ম করে। তারা অসুস্থ হয়।

আসলে সভ্যতাকে ডেফিনিটলি একটু থমকে দাঁড়াতে হবে। এখন যে ফর্মে সভ্যতা চলেছে সেটা কোনভাবেই সাসটেইনেবেল নয়। ফাইভ জি ইন্টারনেট, স্মার্ট সিটি, প্রতিটা গ্রামকে ছোট ছোট নগর তৈরী করতে হবে। মেগা সিটি হবে, ইন্টারনেট দ্বারা সবকিছু কন্ট্রোল হবে, এই যে সভ্যতার মডেল, এটা সাসটেইনেবেল নয় তাতো বহুকাল আগেই বোঝা গেছে। আমরা কি করব? পৃথিবীটা আদৌ থাকবে কিনা সেটাও প্রশ্ন। সেক্টর ফাইভ এখন খালি হয়ে সবাই নিউটাউনে আসতে চলেছে। কারণ ওটা আরও নতুন।, চকচকে, তুলনামূলক সস্তা। যদি বাটানগরে যাই সেখানে বাটার কারখানাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল, স্কুল, স্টেডিয়াম, অফিসারদের বাসস্থান, একটা পুরো নগর তৈরী হয়েছিল। বাটার জুতো তৈরী নানাকারণে ওখানে বন্ধ হতেই পুরোটা জঙ্গল হয়ে গেল।

আজকের ইকনমিক ক্রাইসিস, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, পরিবেশ দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, অ্যান্টার্কটিকা গলে গেলে নবদ্বীপ পর্যন্ত ১০ ফুট জলের তলায় চলে যাবে, তখন গরুর গাড়িতে যাওয়াটাও বিলাসিতা হয়ে যাবে। সাঁতার কেটেই যেতে হবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা এই কান্ডগুলো ঘটাচ্ছে, তাদের মনেও কোন সন্দেহ নেই। এটা সাসটেইনেবেল নয়। এখন তারা বলতে পারেন যে পৃথিবীটাই আর থাকার মত নেই, মার্সে গিয়ে থাকবো। এলিজেবল পিপল্‌দের নিয়ে যাওয়া হবে মঙ্গল গ্রহে। এলিজিবলরা ধনী হয়। সেখানে কাঁচে ঢাকা নিউটাউন, স্মার্ট সিটি হবে। এই গতিতে আমরা যদি পাওয়ার, লাউডনেস, কনজামসন চালিয়ে যাই, পৃথিবীতে আর সাসটেইন করা যাবে না। এটা যারা প্রোমোট করছে তারাও জানে।

দূষণ আগেও ছিল। বাইবেলে নূহর প্লাবনের কথা আছে। হিন্দুপুরাণেও আছে মহা প্লাবনের কথা। নৃতাত্বিকরাতো বলেন বায়ুদূষণে মানুষ নাকে হাত চাপা দিতে দিতেই নাকের ছিদ্র নিচের দিকে হয়েছে। সুতরাং বায়ুদূষণও প্রাচীন। কিন্তু আয়লার পর থেকে সুন্দরবনে দেখছি প্রাকৃতিক দুর্যোগ খুব ঘন ঘন হচ্ছে। বছরে দুটো তিনটে বড় ঝড়। আগে দশবছরে একবার হতো। পৃথিবী জুড়েই বেড়েছে। মৎস্যপুরাণের যুগে বা বাইবেলের কথিত নূহর যুগের সাথে এখনকার সময়ের পার্থক্য হচ্ছে এখন ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যাওয়া আর অসহায়তা বেড়ে যাওয়া। অতীতে মানুষ ছিল একটা গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। মানে সুন্দরবনের একটা দ্বীপে নদীবাঁধ ভাঙলে সেটা গোটা দ্বীপের সকল বাসিন্দার বিষয় ছিল। নদীবাঁধ তাড়াতাড়ি সারাতে হবে এইটা ছিল। এখন প্রতিটা মানুষ একটা ভোট। একটা ইনডিভিজুয়াল। এখানে নদীবাঁধ ভাঙলো কিনা

সেচ দপ্তর দেখবে, বন্যা হলে ত্রাণ পাচ্ছে কিনা দেখবে ত্রাণ দপ্তর। কেন্দ্র টাকা দিল কিনা দেখবে অর্থ দপ্তর। এখন প্রত্যেকে বোঝে যে যদি ঝড় আসে, আমি একা। আগে যত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষ সামলেছে সেটা কমিউনিটি হিসেবে। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে। আধুনিকতা একদিকে কর্পোরেট লাউডনেসকে প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে মানুষকে একা করে দিয়েছে। খুব সিস্টেমেটিকালি করেছে। ২৫ বছর আগে সুন্দরবন গেছি, তখন থেকে সুন্দরবন নিয়মিত দেখছি। কমিউনিটির অনুভূতি আর অবশিষ্ট নেই। প্রত্যেকে এখন ইনডিভিজুয়াল। গ্রামে শীতের রাতে হ্যাজেক লণ্ঠন জ্বেলে সালিশি বিচার হত। তক্কো হতো খুব। সেখানে কেউ বিড়ি খেলে পেছন ঘুরে বসে খেতো। কারণ প্রবীণ বয়স্করাও সেখানে আছে। সভা থেকে উঠে যেতো না কারণ সভার প্রসিডিংস্ সে মিস করবে, তাই পেছন দিকে ঘুরে বসে বিড়ি খেতো। হাতের মুঠোর মধ্যে বিড়িটা নিয়ে। এখন বাবা, বা স্কুলের শিক্ষক যদি সামনে দিয়ে যায়, বিড়িতো দূরের কথা মদের বোতলটাও আড়াল করে না। এখন একটা দুশো বা আড়াইশো কিলোমিটার বেগে ঝড় এলে প্রত্যেকে জানে সে নিজে বা বড়জোর তার পরিবার কিভাবে বাঁচবে। তার বেশী কিছু ভেবে লাভ নেই। তার বাইরে তার কাছে সবটাই কল্পনা বা মিথ্যা। বিভিন্ন বিভাগ আছে। ডিপার্টমেন্ট, বোর্ড এসব আছে। তারা ভাবে সমাজ নেই, তোরও একটা ভোট, আমারও একটা ভোট, সুতরাং তুই কে? এই বোধটা মানুষ অর্জন করেছে, তা নয়। তার ভেতরে এটা ইনজেক্ট করে ঢোকানো হয়েছে। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে আধুনিকতার অন্যতম একটি পিলার। কমিউনিটি ইন্টারেস্ট বলে কিছু নেই। সেটা হচ্ছে ফিউডাল চিন্তা, ব্যাকওয়ার্ডনেস!

প্রশ্ন হল, আড়াইশো বছর আগেই দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচার করেন। মাওজে দং বলেন শত পুষ্প প্রস্ফুটিত হবে। সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের কথাটাও ছিল। এখন তারই চাপে মনে হয় যৌথ প্রতিবাদ। যৌথভাবে অধিকার আদায়ের আন্দোলন এসব তৈরী হচ্ছে। দেউচা পাঁচামীতেও সেটা দেখা যাচ্ছে। মানে মানুষ যে একা, এটা তাকে বোঝানো হয়েছে। মানুষ যখন ঠেলায় পড়ছে সে বোঝার চেষ্টা করছে বোধহয় তার একা থাকাটা সঙ্গত নয়। তখন সে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। তাতে রেজিস্ট্যান্স সফল হচ্ছে না। সে যদি বলে, দাও ফিরে সে অরণ্য। সেটাও সাকসেস নয়। সে আরও দশ জায়গায় উৎসাহ জোগাচ্ছে। কর্পোরেটের স্বার্থে সরকার বা কেউ যদি বলে এ জমি লইব কিনে, সে মাথা নীচু করে চলে যেতে প্রস্তুত। এটা সরকার চাইছে তা নয়, বরং তার বিপরীত। মানুষের চাওয়াটাও ক্রমশ লাউড হচ্ছে। কিন্তু লাউডনেসের বিচারে প্রথমটা হল বফোর্সকামান আর জনগণের প্রতিবাদ প্রতিরোধ চীনে পটকার সমান। কেউ বলতে পারেন চীনে পটকারাও একদিন বফর্স কামান হয়ে উঠবে কিনা, বা সেটা কাম্য কিনা। কিন্তু সেসব ভিন্ন প্রসঙ্গ। □

প্রচলিত জীবিকা থেকে সরে যাবার ফলে দূষণ হচ্ছে

অক্ষয় খাটুয়া

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে গ্রামের গৃহবধূদের ডিজিটাল ফাইনানসিয়াল লিটারেসি শিখিয়ে সেই শিক্ষাকে ওই জেলার বারোটা ব্লকের প্রায় সাড়ে সাতলক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে সেইসব মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেই সমাজসেবার জগতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি অর্জন করেছেন অক্ষয় খাটুয়া। পূর্ব মেদিনীপুরেই হলদিয়া শিল্পাঞ্চল আবার সেই জেলাতেই রয়েছে দূষণ সৃষ্টিকারী কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র। প্রাকৃতিক দূষণ বিষয়ে কি বলছেন এই জেলার বাসিন্দা অক্ষয়?

আমি পূর্ব মেদিনীপুরে গত চার বছর 'ডিজিটাল সখী' নামে একটা প্রোগ্রাম করার কাজে জেলার বারোটা ব্লকে সাড়ে সাত লক্ষেরও বেশী মানুষের কাছাকাছি এসেছি। প্রায় ৪৯০ জন গ্রাম কর্মী আমাকে এই কাজে সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা প্রায় সকলেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গ্রামের নারী। পূর্ব মেদিনীপুরের ভৌগলিক যে অবস্থান, সেখানে অনেক বৈচিত্র্য আছে। একেবারে বঙ্গোপসাগরের ধারে সুন্দরবনের মতোই আরেকটা উপকূল এলাকা। এখানে দীঘা, রামনগর, শঙ্করপুর, তাজপুর, মন্দারমণি, জুনপুট থেকে শুরু করে খেজুরির বর্ডার পর্যন্ত গোটা এলাকাটাই নদী এলাকায় অবস্থিত। প্রাকৃতিক ভাবে যদিও পূর্ব মেদিনীপুর সমতলের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু নদীমাতৃক। ফলে প্রতিবছর উপকূলবর্তী এলাকাগুলো জলমগ্ন হয়। এখানে তখন কৃষির পাশাপাশি মাছ চাষও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ফিশারী তৈরি হয়েছে এই জেলায়। প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশভাগ চাষ জমি, চিংড়ি, ভেনামি, বাগদা, গলদা চাষের জন্য পরিবর্তিত হয়েছে। সেটা সাময়িক বা প্রাথমিক পর্যায়ে লাভজনক হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ভাবে কৃষিজমি যখন মাছ চাষের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হচ্ছে, মাছ চাষিরা পাঁচ-ছয় বছর পরে কয়েকগুণ ক্ষতির মুখে পড়ছে। কারণ মাছ তখন ওই ফাঙ্গাল বা ভাইরাল এফেক্টে মারা যাচ্ছে। কিন্তু তাৎক্ষণিক লাভ পাচ্ছে। জোতদার, জমিদার, ঋণ ব্যবসায়ীরা মানুষকে দাদন দিয়ে ধান চাষ, মধু চাষ, অন্যান্য ফসল চাষ ইত্যাদি থেকে উৎসাহ কমিয়ে মাছ চাষে উৎসাহ বাড়াচ্ছে। এটা আমাদের পরিবেশের খুব ক্ষতি করছে। ধান চাষে একটা লোল্যান্ড থাকত, জলে ডুবে গেলে জলটা বেরিয়ে যাবার জন্যে চ্যানেল থাকত,

খাল বিল পেয়ে যেত। এখন প্রত্যেক ফিশারি বেডকে উঁচু পাড় দিয়ে ঘিরে নেয়। মাঝে চাষজমি থাকলে তাদের জমা জল বের হতে পারে না, তাদের নিকাশি ব্যবস্থা নেই। অগভীর পুকুরের মতো হয়ে থাকছে। ওয়াটার লগিং হয়ে যাচ্ছে। ফলে ধানচাষটা গোটা জেলায় মার খাচ্ছে। ফিশারী কিছু লাভের মুখ দেখলেও, বর্ষার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার দেখা আয়লা, বুলবুল, আমফান, ইয়াশ এইসব দুর্যোগে আমি এখান থেকে বিপর্যয়ের ভয়াবহতা দেখেছি। সুন্দরবনের মতই পূর্ব মেদিনীপুর একই পরিমাণে এইসব দুর্যোগের ফল ভোগ করে। সেটা খুব খারাপ ভাবেই হয়।

পূর্ব মেদিনীপুরে নানারকম অর্থকরী কাজকর্ম চলে। এটা একটা ইকনমিক জোন। নানা কিছুই চলে, যেমন, হেয়ার প্রসেসিং ব্যবসা হয়, চুল ব্যবসা। এইসব চুল ব্যবসাতে অনেক ক্ষতিকারক ঘটনা ঘটছে। চীন দেশ থেকে বহু ভেন্ডার বা ক্রেতারা এসে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ওয়ান এবং টু, পটাশপুর, কাঁথি, নন্দীগ্রাম, রেয়াপাতা, নন্দকুমার, এইসব এলাকায় মানুষকে চুল ছাড়াবার জন্য টাকাপয়সা দেয়। কিন্তু চুলগুলো খুবই অস্বাস্থ্যকর। যারা সেটা নিয়ে কাজ করে তারা নানারকম রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সেখানে ক্যানসার, আলসার, ডায়বেটিস, প্রেসার, সুগার, চর্মরোগ প্রভৃতিতে তারা আক্রান্ত হচ্ছে। কারণ ওই চুলগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে। খুবই অপরিচ্ছন্ন, প্রচুর পরিমাণে রোগ জীবাণু থাকে। এক. কে.জি. চুল ছাড়ালে হয়ত ৫০০ টাকা পাচ্ছে। কিন্তু এক, দুই, তিন মাস পরেই সে এমনসব রোগে আক্রান্ত হচ্ছে যে ইনকামের কয়েকগুণ বেশী তার চিকিৎসা খরচ হচ্ছে। বিগত দশ বারো বছরে অর্থনীতি কর্মনীতি এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে দৈনন্দিন জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে মানুষকে বিকল্প ভাবতে হয়েছে। ওরা ধান চাষ করত, পান চাষ করত, সব্জি চাষ করত। বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে তারা অন্য বিন্দুতে চলে যাচ্ছে। তখন দেখছে ব্যবসা করতে গেলে, ব্যবসায় লাভ করতে গেলে প্রতিযোগিতা অনেক, তাই বিনিয়োগ বেশী লাগছে। ফলে তারা দৈনন্দিন লেবার হিসেবে এই হেয়ার প্রসেসিং-এ যুক্ত হচ্ছে। কিংবা রেডিমেড পোশাক বা মাছচাষে শিফ্‌ট করছে।

পরিবেশগত দিক দিয়ে দেখলে, মানুষ নিজ-নিজ জায়গা থেকে সরে গিয়ে একেবারে চটজলদি সমাধানে যেতে চাইছে। তাই মানিমার্কেট, লটারী খেলা প্রভৃতিতে যত মানুষ আগ্রহ দেখাচ্ছে তাদের ট্রাডিশনাল ব্যবসা থেকে সরে যাওয়ায় কৃষি মার খাচ্ছে। গবাদি পশুপালনের উদ্যোগ কমেছে, পোলট্রিতে আগ্রহ কমেছে, ফিশারীতে আগ্রহ বাড়লেও কয়েকগুণ লোকসান হচ্ছে।

পূর্ব মেদিনীপুর সমতল এলাকা, এত বেশী মানুষ এখানে গাছ কেটে ফেলছে, বৃক্ষরোপণ করা খুব দরকার। যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আটকাতে হয়, সমগ্র উপত্যকায় ম্যানগ্রোভ প্লানটেশনেরও বহু সুযোগ আছে। রিভার সাইডের পাশাপাশি ইনার সাইডে

এগ্রো-ফরেস্ট্রি করা দরকার। তার ফলে চিরহরিৎ হবে, অক্সিজেন সৃষ্টি হবে। বন্যা কমবে, ভূমিক্ষয় কমবে। নানারকম ফলের গাছ, টিম্বার প্ল্যান্ট করে জীবন জীবিকাও হতে পারে। ডিজাস্টার বিষয়ে সচেতনতার সৃষ্টিও দরকার। ডিজাস্টার রিস্ক কমানোর জন্য। প্রাকৃতিক বিষয়ে কাজ করার যে বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট আছে, তাদের সংযুক্ত করে একবারে ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম করা দরকার। পূর্ব মেদিনীপুরে যেসব পেশা ও জীবিকা ছিল, সেগুলো ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও চালাতে হবে। দীর্ঘদিনের যে ট্র্যাডিশনাল সাবজেক্ট ছিল, সেগুলোর মধ্যে অনেক বেশী ডাইভার্সিফিকেশন ছিল। প্রকৃতিকে রক্ষা করারও বিষয় ছিল।

নগরায়নের নাম করে গোটা হলদিয়াকে নেওয়া হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার নাম করে এই জমি নেওয়া হয়েছিল। গত ২০-২৫ বছরে নতুন কোন ইন্ডাস্ট্রি আসেনি। না গভর্নমেন্ট না এন.জি.ও কেউ কিছু করে না। ধূ ধূ মাঠ হয়ে গেছে। এগুলোতে প্ল্যানটেসন করলে প্রচুর রেভেনিউ কালেকসনের সম্ভাবনা আছে। দীঘা একটা ট্যুরিজম এলাকা। কোলাঘাট পর্যন্ত যে নদীতট রয়েছে, সেখানে ম্যানগ্রোভ তৈরি করা সম্ভব। এছাড়া যেটা না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে আমরা এখন অনেক বেশী রাসায়নিক সার বিষ দিয়ে চাষ করছি। মাছচাষ থেকে ধানচাষ বা যে কোন চাষেই রাসায়নিক এখন মাস্ট হয়ে গেছে। এখন সময় এসেছে জৈব চাষে উৎসাহ দেওয়ার। যদি জৈব চাষটা বাড়ান যায়। মানুষকে যদি দুটোই পাশাপাশি রেখে দেখাতে পারি, তাহলে জমির উর্বরতা বাড়বে বন্ধ্যাত্ব কমবে। এই রাসায়নিকগুলো ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ক্ষতি, জলবায়ুর ক্ষতি, রোগের বৃদ্ধি হচ্ছে, সেটা আটকাবে। পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষ কিন্তু খুব বেশী চেন্নাই, বাঙ্গালোর, ভেলোর কিংবা উড়িষ্যাতে যায় চিকিৎসা করাতে। নানারকম মারণব্যাধি নিয়ে যাচ্ছে। তার কারণ কম সময়ে অধিক মাত্রায় উৎপাদন করতে গিয়ে এর ক্ষতিকারক দিকগুলো কোথাও কোনও চর্চার মধ্যে আনছে না। বিভিন্ন কোম্পানি তাদের রাসায়নিক সার ব্যবহারে অফার দিয়ে উৎসাহ যোগাচ্ছে। আমাদের যে গোবরসার, অ্যাজোলা, কচুরিপানার ব্যবহার ছিল, সেসব ভুলে গিয়ে আমাদের মূল তিনটে ফসল ধান, পান, মাছ তিনটেতেই রাসায়নিক প্রয়োগ হচ্ছে। অনেক সরকারী দপ্তর আছে। কিন্তু গণ সচেতনতা নিয়ে যেভাবে কাজ হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে না। তাই এই কাজটার মধ্যে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন যে কোন মানুষ বা সংগঠনের এগুলি নিয়ে কাজ করা দরকার। আগামী পাঁচ বছরে পূর্ব মেদিনীপুরে এটা নিয়ে একটা মডেল তৈরি করার সুযোগ রয়েছে। কারণ সেখানে মানুষ কিছুটা হলেও শিক্ষার দিক দিয়ে এগিয়েই আছে।

দূষণের কথা উঠলে বায়ুদূষণ, জলদূষণ সবই আসবে। সবার আগে আসবে জলদূষণের কথা। পূর্ব মেদিনীপুরে চার ফুট গর্ত খুঁড়লেই জল পাওয়া যায়। সেটা

পানের অযোগ্য, কিন্তু জল আছে। যত কেমিক্যাল চাষের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, সেটা চুঁইয়ে মাটির তলার জলকে দূষিত করছে বিভিন্ন স্তরে। ক্রমশ পেয় জলের স্তরেও সেটা যাচ্ছে। জলবাহিত রোগ এই জেলায় অনেক বেশী। মাছ, ধান, পাট তিনটে চাষেই কীটনাশক সহ বিভিন্ন কেমিক্যাল চলে যাচ্ছে জলস্তরে। আয়রন যেমন বেশী থাকে, তেমনই এসব ক্ষতিকারক রাসায়নিকও বেশী থাকে। ফলে, চোখের রোগ, চামড়ার রোগ, হার্টের রোগ বেশ অনেকটাই বেশী। পেটের রোগের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। জৈব চাষে গুরুত্ব দিতেই হবে। জলদূষণের বিষয়ে মেদিনীপুর একেবারে ভালনারেবল এরিয়া বলে মনে হয়। আবার জলের সমস্যাও যেমন আছে, জলের সোর্সও অনেক আছে। এই সোর্স ম্যানেজমেন্টটা খুব দরকার। চিকিৎসা ব্যবস্থায় সরকারকে অনেক বিনিয়োগ করে হাসপাতাল বানিয়ে সাবসিডি দিতে হচ্ছে। কিন্তু রোগগুলো কেন হচ্ছে সেটার বিষয়ে সচেতন নয় কেউ। মানুষ তার ফলে কেনা জল খাচ্ছে, প্লাস্টিকের বোতলে ভরা। মাত্র ৩০ বছর আগেও এই প্লাস্টিকের বোতলে এই কেনা জলের ব্যবহার ছিল না। আসলে অপরিশোধিত জলটাই একটা কার্বন ফিলটার বা অ্যাক্টিভেটেড ম্যাঙ্গানিজ ফিলটার করে মানুষ খাচ্ছে। জলটা পরীক্ষা করে কেউ দেখছে না যে, তাতে কতোটা ফ্লুরাইড, আয়রন বা ম্যাঙ্গানিজ বা আর্সেনিক আছে। সব ওয়াটার সোর্স বাদ দিয়ে কেনা জল পানের ঝোঁক বাড়ছে। চতুর্দিকে প্লাস্টিকের বোতল আর ক্যারিব্যাগে ছেয়ে যাচ্ছে। বোতলের রিসাইকেল হচ্ছে না। প্লাস্টিক থাকার ফলেও দূষণ হচ্ছে। এত কম মাইক্রনের প্লাস্টিক আর সেগুলো খাল বিল নদী নালা ঝোপ সর্বত্র ফেলে নিকাশি ব্যবস্থার বারোটা বাজছে। ফুডহাইজিনের বারোটা বাজছে। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের সরকারি ব্যবস্থা আগে ছিল। এখনতো চোখে পড়ে না। এসব কথা সরকার বিরোধী কথা নয়। সরকারতো আমরাই, সরকারকে সব বিষয়ে দোষ দিয়ে কি হবে? আমরা নিজেরাই সচেতন নই। গোটা জেলা জুড়ে এই ডিজিটাল সখী প্রোগ্রাম চালাতে গিয়ে যা দেখেছি তাই বলছি।

বায়ুদূষণের কথায় যদি আসি, সারা পশ্চিমবঙ্গে দু-তিনটে জায়গা যদি ধরি ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল দূষণের তীর্থস্থান হচ্ছে হলদিয়া, কোলাঘাট, আসানসোল, দুর্গাপুর এলাকায়। হলদিয়ার যে বিভিন্ন কলকারখানার নির্গত গ্যাস আর কোলাঘাটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্রীনহাউস গ্যাস সঙ্গে কয়লার ছাই ধোঁয়া এবং ধুলো বায়ুর দূষণ ঘটাচ্ছে। প্রচুর ইটভাটা রয়েছে এই নদীকেন্দ্রিক এলাকায়। ধোঁয়া ধুলোর দূষণ প্রচণ্ড। কিন্তু হলদিয়ায় বা কোলাঘাটেতো কলকারখানা বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করা যাবে না। ফসিল ফুয়েলের বিকল্প গড়ে তুললে কোলাঘাটের উপর চাপটা কমবে। বিশেষ করে স্কুলের শিশু, আর যারা সিওপিডি রোগী, তাদের মাস্ক ব্যবহার করতে বলা দরকার। ইন্ডাস্ট্রি রুল অনুসারে এই কলকারখানাগুলো চলছে কিনা, দূষণ নিয়ন্ত্রণে তাদেরও ভূমিকা আছে। সেটাও দেখা দরকার। □

অথ পরিবেশ বিষয়ে দু-চার কথা

ড: দীপংকর রায়

'পরিবেশ' বিষয়টা নিয়ে কর্মীদের যদি কাজ করতে হয়, তাহলে পরিবেশকর্মীদের হাতে বিজ্ঞান সম্মত তথ্য থাকা দরকার, তাই একটু বিশদেই আলোচনা করছি আমাদের সহযোদ্ধাদের সুবিধার্থে।

ইংরেজি ইকোলজি শব্দটি এসেছে গ্রীক 'অয়কস' (oikos) এবং লগোস্ (Logos) শব্দ দুটি যোগ করে। গ্রীক ভাষায় 'অয়কস' কথাটার মানে বাড়ি বা থাকার জায়গা। আর লগোস্ কথাটার মানে জানা বা বোঝাবুঝি। ১৮৭০ সালে জার্মান লেখক আর্নস্ট হ্যাকেল প্রথম অয়কোলজি শব্দটি তৈরী করেন, ইংরেজী অভিধানে 'ইকোলজি' কথাটি গৃহীত হয়েছে তারও অনেক পরে। ইংরেজী ভাষায় ইকোলজি শব্দটির মানে কি? অক্সফোর্ড ডিক্সনারী অনুযায়ী ইকোলজি হল, 'Branch of Biology dealing with living organisms, habits, modes of life and relations to their surroundings.'

সোজা কথায় ইকোলজির মানে দাঁড়ালো জগৎ এবং জীবন এই দুয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় শাস্ত্র। ইকোলজি বিজ্ঞানেরই একটি শাখা যার আলোচ্য বিষয় হল, জীবন্ত প্রাণীসমূহ, তাদের অভ্যাস, জীবন প্রণালী, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক।

সুতরাং ইকোলজি কথাটার মানে কিছুতেই পরিবেশ হতে পারে না। পরিবেশ বলতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রাকৃতিক নানারকম পরিবেশ বোঝায়। ইকোলজি এই বৃহৎ পরিবেশের একটা খুব সামান্য অংশমাত্র, কখনোই সমগ্র নয়। সংক্ষেপে ইকোলজি মানে বলতে হলে বলতে হবে, 'প্রতিবেশ বিজ্ঞান', পরিবেশ নয়। প্রতিবেশ। প্রতিবেশী কথাটার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত যেমন পাশের বাড়ির লোক আপনার প্রতিবেশী। তেমনি ব্যাঙ, ইঁদুর, জলজ প্রাণী উদ্ভিদ এরাও

আমাদের প্রতিবেশী। এবার ইকোলজি মানে কেন 'প্রতিবেশ' কথাটা ব্যবহার করা উচিত, সেটা অনুধাবন করা যাক।

কথা হল 'ইকোডিসহামনি'-টা কী? 'ইকোহারমণি বললেই 'ডিসহারমণি' ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে। কারণ 'পরিবেশ দূষণ' কথাটা আজকাল বাজারে খুব চলছে। অথচ পরিবেশ দূষণ বলতে যে রাজনৈতিক সাংসারিক সামাজিক পরিবেশেরও দূষণ বোঝায়, সেটা আমরা বুঝতে চাই না। পরিবেশ দূষণ বলবো, আবার শুধুই আলো বাতাস জল মাটির কথা ভাববো সেটা হয় না। জল আলো বাতাস মাটির দূষণ বললে সেটা পরিবেশ দূষণ নয়, অন্য কিছুর দূষণ বোঝাবে।

কোন একটা বিশেষ পরিবেশে প্রাণী এবং উদ্ভিদের সার্বিক সমন্বয়কে বলা যায় 'ইকো সিস্টেম'। যেমন অরণ্য একটি ইকোসিস্টেম। অরণ্যে প্রাণী আছে আবার উদ্ভিদও আছে—তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটা না থাকলে আরেকটাও থাকবে না। আবার বিভিন্ন রকম জলজ প্রাণী উদ্ভিদ প্রভৃতি নিয়ে যে সমুদ্র বা নদী কিংবা একটা হ্রদ, সেখানে উদ্ভিদ আর জলজ প্রাণীগুলো একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তাই ওই সমুদ্র নদী অথবা হ্রদ হচ্ছে এক একটি ইকো সিস্টেম। সুতরাং ভারসাম্যহীনতা বা দূষণ ব্যাপারটা কখনোই বিজ্ঞানের ওই শাখাশাস্ত্রটির উপর হতে পারে না। ভারসাম্যহীনতা বা দূষণ যদি হয়, তাহলে সেটি হবে ইকো-সিস্টেমের মধ্যে। সুতরাং কথাটা বলতে হবে "ডিস ব্যালেন্স ইন ইকো সিস্টেম"। ইকোলজিক্যাল ডিসব্যালেন্স বললে ভুল বলা হবে। ইকোসিস্টেমে কেন ব্যালেন্স থাকছে না, সেটা বুঝতে হলে আবার হারমনি ব্যাপারটাও জানা দরকার।

হারমনি কিভাবে হয়? অঙ্কের নিয়মে শব্দের ওঠা নামার জন্যে যে সুর সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় হারমনি। হারমোনিয়ামের রীডগুলি নীচু পর্দা থেকে উঁচু পর্দার দিকে এমনভাবে সাজানো থাকে যে, সা ধ্বনির থেকে রে ধ্বনি যতটা উঁচুতে, 'রে' থেকে গা ধ্বনিটি ঠিক ততখানি উঁচুতে। এইভাবে সমান দূরত্বের এক একটি ধ্বনি সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি। এই সাতটি ধ্বনির সমন্বয়ে একটা হারমনি বা ঐকতান সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে কোন একটা ধ্বনি যদি তার আগের বা পরের ধ্বনির চেয়ে কম বা বেশী পর্দায় নেমে যায় বা উঠে যায়, তাহলে সুর কেটে যাবে। হারমনি বা ঐক্যতান নষ্ট হবে।

জীব এবং জগতের মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে এইরকম একটা হারমনি বা ঐকতান আছে। আর হারমনির উপর নির্ভর করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বা ইকোসিস্টেমের ব্যালেন্স; প্রকৃতির রাজত্বে কোন কিছুই অর্থহীন নয়। অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রকৃতির উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্যেই নিরন্তর প্রাকৃতিক বিবর্তন চলেছে। যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনারই একটা নিজস্ব নিয়ম আছে, সেই নিয়মটি হচ্ছে 'জাগতিক

নিয়ম'। প্রকৃতির রাজত্বে এই সমুদ্র পর্বত আগ্নেয়গিরি মানুষ কিংবা আণুবীক্ষণিক জীব অ্যামিবা, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি, মহাশূন্যের বিভিন্ন পর্যায়ে এরকম যত সৌরজগৎ গ্যালাক্সি আছে, গ্রহ আছে, উপগ্রহ আছে, জীব আছে বা নেই, এই সমস্ত কিছুর থাকা বা না থাকা, তাদের পরিবর্তন বিবর্তন আবর্তন যা কিছু সবই প্রকৃতির এই নিজস্ব নিয়ম বা জাগতিক নিয়মের উপর নির্ভরশীল। এই নিয়মটি খুবই সুসংহত সুনির্দিষ্ট। তার নিজস্ব গতি আছে, চাপ আছে, উষ্ণতা আছে। চুলচেরা তার হিসেব। যেমন দুভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক ভাগ অক্সিজেনের ভাগটাও দুই হয়ে গেলে আর জল মিলবে না হাইড্রোজেন পারক্সাইড পাওয়া যাবে। প্রকৃতির এই নিয়মকানুনগুলো জেনে বুঝে সেগুলোকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারলে ইকোসিস্টেমের হারমনিটা বজায় থাকত।

জাগতিক নিয়মগুলো সর্বদাই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। চরাচরের প্রতিটি বস্তুই পরস্পর নির্ভর। যেমন প্রাণী জগতের বাঁচার জন্যে যে অক্সিজেন দরকার, সেটা অনেকটাই আসছে গাছপালা, জলাশয় প্রভৃতি থেকে, গাছপালা আবার বাঁচার জন্যে জল নিচ্ছে মাটি থেকে, মাটির নিচের জল আবার থাকবে কি থাকবে না সেটা নির্ভর করছে সেই জল কি পরিমাণে তুলে নেওয়া হচ্ছে তার উপর। কতটা তোলা হবে, না হবে সেটাও আবার নির্ভর করে বৃষ্টির পরিমানের উপর। কতটা বৃষ্টি হবে তাও আবার নির্ভর করে সমুদ্র বা নদী থেকে কতখানি জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে প্রভৃতি নানা কারনের উপর। এইভাবে গোটা প্রাকৃতিক ব্যাপারটাই চলছে চক্রাকারে, একের উপর অন্যটা নির্ভর করে। সুতরাং পরস্পর নির্ভরতাই যেখানে একমাত্র শর্ত, সেখানে কেউ যদি তার নিজের সাময়িক প্রয়োজনে কোন একটা পর্যায়কে নষ্ট করে দেয়, তাহলে গোটা ব্যাপারটাই যে ডামাডোল হয়ে যাবে, সেটা বোঝা খুবই সহজ।

ইকোসিস্টেম ঠিকঠাক থাকা না থাকাটা নির্ভর করে চারটি ব্যাপারের উপর ঃ

১। পারিপার্শ্বিক—এর মধ্যে রয়েছে সূর্যের কিরণ, জল, অক্সিজেন, খনিজ, মৃত উদ্ভিদ ও পশু।

২। সবুজ উদ্ভিদ—তা অতি ক্ষুদ্র বা বিশালাকার হতে পারে, কিন্তু এই সবুজ উদ্ভিদ বিশোষণ করে সৌরশক্তি যার ফলে খাদ্য উৎপন্ন হয়।

৩। প্রাণী—যে সব প্রাণী লতাপাতা খেয়ে বেঁচে থাকে।

৪। ডিকমপোজার—ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস বা কীটপতঙ্গ হচ্ছে এই শ্রেণীভুক্ত, তারা মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীকে ভেঙে দিয়ে পরিবেশকে শক্তি যোগায়।

মনে রাখা দরকার যে ইকোসিস্টেম কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বদলেও যায়। এই পরিবর্তন বা বদলটা সব সময় নিরবচ্ছিন্নভাবেই ঘটছে।

বিভিন্ন রকম ইকোসিস্টেমের মধ্যে মানুষের ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রকৃতির মধ্যে প্রয়োজনবোধে মানুষই সচেতনভাবে নিজের কার্যধারা বদলাতে পারে। একমাত্র মানুষই প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার পরিণাম ভাল বা মন্দ যাই হোক।

পরিবেশ দূষণ কথাটা যেভাবে ব্যবহার হয়, তার অর্থ ইকোসিস্টেমটা ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাওয়া। তার জন্য দায়ী প্রধানত মানুষ, কারণ মানুষই একমাত্র সচেতন জীব যে চেষ্টা করে ইকোসিস্টেমকে বাঁচাতেও পারে।

দুই

এখন এই যে বলা হচ্ছে ইকোসিস্টেম নষ্ট হওয়ার কারণ মানুষ, এর ফলে প্রশ্ন জাগে মানুষ কীভাবে দায়ী। এ প্রসঙ্গে দুটি মত প্রচলিত।

প্রথমত : মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিই ইকোসিস্টেমকে নষ্ট করেছে। দ্বিতীয়ত: কিছু মানুষের অপরিণামদর্শী পরিকল্পনাহীন কাজকর্ম ইকোসিস্টেমকে নষ্ট করেছে।

পৃথিবীতে মানুষের আগমন ঘটেছে কুড়ি লক্ষ বছর আগে। কিন্তু আজ থেকে মাত্র ১৭০ বছর আগেও ১৮৩০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল একশো কোটি। তার মানে প্রথম একশো কোটি জনসংখ্যা বাড়তে সময় লেগেছে কুড়ি লক্ষ বছর। আর ১৮৩০ থেকে ১৯৩০ এই একশো বছরের জনসংখ্যা হয়েছে প্রায় দুশো কোটি। মানে কুড়ি লক্ষ বছরে যে বৃদ্ধি হয়েছে, সেই বৃদ্ধি ঘটল মাত্র ১০০ বছরে। তারপর ১৯৩০ থেকে ১৯৬০, এই তিরিশ বছরে জনসংখ্যা হল তিনশো কোটি। মানে তিরিশ বছরে একশো কোটি বৃদ্ধি। তারপর ১৯৬০ থেকে ১৯৭৫ এই মাত্র পনেরো বছরে আরও একেশো কোটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চারশো কোটি হয়েছে। এই হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্পীড বা গতি অনেকটা সাম্প্রতিক অতিমারি বা প্যান্ডেমিকে করোনা ভাইরাস বৃদ্ধির মত।

এই হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে কি ঘটতে পারে দেখা যাক। পৃথিবীর ওজন হচ্ছে $(৬\times১০)^{২৪}$ কেজি। জনসংখ্যা এই হারে বাড়তে থাকলে, পৃথিবীর ওজন আর মানুষের ওজন সমান হয়ে যেতে পারে। এই বৃদ্ধির হার সুতরাং খুবই যে অস্বাভাবিক তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আর জনসংখ্যা যত বাড়বে, চাহিদাও তত বাড়বে। কারণ জনসংখ্যা যে হারে বাড়বে, শক্তি বা জ্বালানীর চাহিদা অনুসারে যোগান এই পৃথিবীর থেকেই দিতে হবে পৃথিবীর আয়তন বৃদ্ধি না ঘটিয়ে। সেটিও কতদূর সম্ভব তা ভাববার বিষয়। প্রকৃতির মধ্যে দেখা সমস্ত জীবই সমস্ত যুগে বিস্ময়কর সব কৌশল অবলম্বন করে নিজেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত রাখে। তাদের প্রজনন ক্ষমতা কখনোই পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হয় না। বলা বাহুল্য মানুষের সংখ্যাও নিয়ন্ত্রিত ছিল, অস্বাভাবিক বৃদ্ধিটা শুরু হয়েছে মাত্র দেড়শো বছর আগে থেকে।

অসামান্য সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আমরা মৃত্যুর হার কমাতে পেরেছি কিন্তু জন্মের হার কমানো সম্ভব হয়নি। সুতরাং বিজ্ঞানের সাফল্য এসেছে অসমভাবে।

বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর 'লাইফ সার্কেল' বা জীবনচক্রের দুটি ভাগ। একটি কেন্দ্রীয় বলয় বা অন্তর্বলয়, দ্বিতিয়টি বহির্বলয়। মানুষ সমেত পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই হচ্ছে বহির্বলয়ের অংশ। জীবনের কেন্দ্রীয় বলয়ের স্থান অধিকার করে আছে সবুজ উদ্ভিদ এবং অন্যান্য জীবাণুরা। বহির্বলয়ে বসবাসকারী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী খাদ্য এবং শক্তি সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে কেন্দ্রীয় বলয় থেকে। সুতরাং কেন্দ্রীয় বলয়কে উপেক্ষা করা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। বলা যায়, বহির্বলয়ের মানুষসহ সকল প্রাণীর সংখ্যার অস্তিত্ব নির্ভর করে কেন্দ্রীয় বলয়ের উদ্ভিদ ও জীবাণুর সংখ্যার উপর। বিজ্ঞানীদের মতে প্রতি এক ভাগ প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে তার চার পাশে সাতাত্তর ভাগ উদ্ভিদের অস্তিত্ব রক্ষা করা চাই। কেননা কেন্দ্রীয় বলয়ে যত পরিমাণ সৌরশক্তি সংগৃহীত হয়, তার প্রায় ৯০ ভাগ উদ্ভিদ ও জীবাণুর নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে খরচ হয়ে যায়। খুব সামান্য পরিমান শক্তিই বহির্বলয়ে এসে পৌঁছাতে পারে। তাছাড়া উদ্ভিদের দেহের সবটুকুও প্রাণী গ্রহণ করে না। সুতরাং গ্রহণ না করা অংশটুকুতেও নষ্ট হয় কিছুটা শক্তি। অতএব দেখা গেছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষার সঠিক অনুপাত ৯৯:১। এদিকে প্রতিদিন মানুষের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই হারে কিন্তু কেন্দ্রীয় বলয় থেকে খাদ্য ও শক্তির জোগান বাড়ছে না। বরং উদ্ভিদের আচ্ছাদন প্রতিদিন কমেই যাচ্ছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শক্তি আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি প্রায় সকল সমস্যার মূলেই রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা। ম্যালথাস সাহেবের মতে, প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টিচক্রের নিয়মানুসারে এই অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারটিকে সমাধান করে ফেলবে। এবং এই সমাধান আসবে জনসংখ্যা কমানোর মাধ্যমেই, অর্থাৎ মানুষ যদি সচেতনভাবে জনসংখ্যা কমানোর দিকে মনোযোগ নাও দেয়, প্রকৃতিই তার নিয়মানুসারে পৃথিবীতে এক বিস্তীর্ণ ধ্বংসলীলা চালাবে।

ইকোসিস্টেম ডিসব্যালেন্স হওয়ার কারণ হিসেবে দ্বিতীয় প্রচলিত মতটি হল, জননেতাদের ভুল পরিকল্পনা বা পরিকল্পনাবিহীনভাবে কায়েমী স্বার্থসিদ্ধির জন্যে প্রকৃতির উপর নীতিহীন শোষণ বা অপব্যবহার কিংবা অতিব্যবহার।

দ্বিতীয় এই মতবাদটি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হতে গেলে জানা দরকার যে, ইকোসিস্টেম বলতে প্রধানত যেগুলি নষ্ট হচ্ছে, তা হল বাতাস, জল, আর মাটি। এই বাতাস জল আর মাটি তিনটি প্রধান ইকোসিস্টেম যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলেই পৃথিবীর সামগ্রিক ইকোসিস্টেম যে ধ্বংস হয়ে যাবে, সে কথা বলাই বাহুল্য, কেননা, অন্যান্য সমস্ত ইকোসিস্টেমই এই তিনটির কোন একটি, দুটি বা তিনটির উপরেই নির্ভরশীল।

তিন

বাতাস : বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, মানুষ খাদ্য ছাড়া বাঁচতে পারে পাঁচ সপ্তাহ, জল ছাড়া পাঁচদিনের কাছাকাছি আর বাতাস ছাড়া খুব বেশী হলে পাঁচ মিনিট। সুতরাং মানুষের কেবল বেঁচে থাকার জন্যে যাবতীয় দরকারী উপাদানের মধ্যে বাতাস হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক উপাদান। এই বাতাসের মধ্যে স্বাভাবিক উপাদান হিসেবে থাকে নাইট্রোজেন ৭৮.০৩%

অক্সিজেন ২০.৯৯%

কার্বন ডাই-অক্সাইড ০০.০৩%

এছাড়া মিথেন এবং অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস সামান্য পরিমান। এই মূল উপাদানগুলির বাইরে যে কোন কঠিন তরল বা গ্যাসীয় উপাদান যদি বাতাসে যুক্ত হয়, তাহলে সেই বাতাসকে বলা হবে দূষিত বাতাস। প্রাথমিক ভাবে এই সব দূষণকারী পদার্থগুলিকে বিজ্ঞানীরা যা চিহ্নিত করেছেন তা হল : ভাসমান বস্তুকণা, সালফার ডাই অক্সাইড বা SO_2 এবং অন্যান্য সালফার মিশ্রিত গ্যাসীয় বা কঠিন বা তরল, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রোকর্বন, ক্লোরাইড এবং ভারী ধাতুসহ আরও কিছু দূষিত গ্যাস। এটা আমরা সকলেই জানি যে, বাতাসে যাবতীয় উপাদানের মধ্যে কেবলমাত্র অক্সিজেন গ্যাসই জীবের শ্বাসকার্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক বাতাসে এই অক্সিজেনের পরিমাণ মাত্র ২০.৯৯%। জীবের শ্বাসকার্য ছাড়াও অক্সিজেনের আরও যে প্রধান ব্যবহার হয়, তা হল যে কোন জিনিস দগ্ধ হওয়া মানেই অক্সিজেনের সংস্পর্শে থাকা। অর্থাৎ কোন কিছু পোড়ালেও অক্সিজেন খরচ হয়। কারণ অক্সিজেন ছাড়া কিছু পোড়ানো যায় না।

বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখেছেন যে, একটি বিমান যে কোন অন্তর্দেশীয় যাত্রায় পঞ্চাশ থেকে একশো টন অক্সিজেন পুড়িয়ে ফেলে। এবং একই পরিমাণ অক্সিজেন পুড়ে যায় এক টন কয়লার দহনে।

তাহলে পৃথিবীর কলকারখানাগুলি এবং যানবাহনগুলি যে বিপুল অক্সিজেন খরচ করছে, বাতাসে এত অক্সিজেন আসছে কোথা থেকে?

পৃথিবীর অক্সিজেনের মূল উৎস প্রধানত দুটি। প্রথমত সবুজ উদ্ভিদ, দ্বিতীয়ত জল। সবুজ উদ্ভিদ তাদের শ্বাসকার্যে যে অক্সিজেন ত্যাগ করে সেটি অক্সিজেনের এক বিরাট উৎস। আর জলের কণিকা ভেঙে গিয়েও অক্সিজেন সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু হিসেবে দেখা গিয়েছে, শুধুমাত্র আমেরিকার কলকারখানাগুলি যে পরিমাণ অক্সিজেন পোড়ায়, ওই দেশের সমগ্র বন-সম্পদ তা সাপ্লাই দিতে পারে না।

প্রশ্ন জাগে যে, একেবারে দূষণমুক্ত বাতাস এই পৃথিবীতে আদৌ পাওয়া সম্ভব কিনা। মানুষের দৈহিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নানারকম গ্যাসীয় পদার্থ বাতাসে

স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে। মানুষ সেগুলি গ্রহণও করছে। কিন্তু দূষণ পদার্থের মাত্রাতিরিক্ত গ্রহণ খুবই ক্ষতিকারক।

বাতাসে দূষক পদার্থের গ্রহণীয় মাত্রা হল—

মিলিগ্রাম প্রতি ঘনমিটারে

কার্বন ডাইঅক্সাইড	৯.০
কার্বন মনোক্সাইড	১১০
ক্লোরিন	৬০
হাইড্রোজেন সালফাইড	৬০
সালফার ডাইঅক্সাইড	০.০১
নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড	৫
ডাই অ্যালড্রিন	১.৩
ক্লোরোফর্ম	৩
ফসফিন	৮
ওজোন	০.২
সীসা	০.৫
নিকোটিন	০.১

প্রতি ঘনমিটার বাতাসে এই বস্তুগুলি প্রদত্ত পরিমানের চেয়ে বেশী থাকলেই তা আমাদের শরীরকে প্রভাবিত করে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি ক্ষতিকারক গ্যাসগুলি বাতাসে কীভাবে এবং কত পরিমাণে বাড়ছে, সেটির হিসেব করা দরকার। কার্বন ডাইক্সাইড প্রধানত জীবের শ্বাসপ্রশ্বাস, কলকারখানা, মোটর গাড়ি থেকে, দাহ্যবস্তু যেমন কয়লা তেল প্রভৃতি দহনের ফলে এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত পৃথিবীপৃষ্ঠের চুনাপাথর নানারকম অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে তৈরী হয়। সবুজ উদ্ভিদ এই কার্বন ডাইঅক্সাইড নিজেদের শ্বাসকার্যে গ্রহণ করে বলেই বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ খুব একটা বেড়ে যায় না। কার্বন ডাইক্সাইড বাতাসে যদি বেড়ে যায়, তাহলে কিন্তু মহা গণ্ডগোলের ব্যাপার হয়ে যাবে।

গণ্ডগোলটা কী?

গরম দেশের গাছ যদি ঠাণ্ডাদেশে লাগানো হয়, তাহলে স্বাভাবিক কারণেই সে গাছ বাঁচে না। তাই সেক্ষেত্রে একটা কাঁচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো ভেতরে ঢোকে; গাছগুলো থাকে কাঁচের ঘরের মধ্যেই। সূর্যের আলোয় গাছ নিজের স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখতে পারে, কিন্তু তার মূল যে জল শোষণ করে, সেটা পাতার

মধ্যে দিয়ে বাষ্পীভূত হয়ে কাঁচ ভেদ করে বের হতে পারে না। এই ঘরটাকে বলা হয় গ্রীন হাউস। আর তার কার্যপদ্ধতিটা হল গ্রীনহাউস এফেক্ট। এখন কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে বেড়ে গেলে তা বায়ুমণ্ডলের উপর ছাদ তৈরী করে ভেসে থাকে। সেই স্তর ভেদ করে সূর্যের রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে পারছে, ফলে পৃথিবী গরম হচ্ছে, সন্ধ্যের সময় উত্তাপটা কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড ভেদ করে আর ফিরে যেতে পারে না। একে বলে গ্রীন হাউস এফেক্ট। ফলে পৃথিবী ক্রমশ গরম হয়ে উঠবে। সূর্যের উত্তাপকে কার্বন ডাই অক্সাইড ফিরে যেতেই দিচ্ছে না। পৃথিবী গরম হয়ে গেলে মানে স্বাভাবিকের থেকে মাত্র চার ডিগ্রি বেড়ে গেলেই সুমেরু এবং কুমেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাবে, তার ফলে বরফগলা জল সমুদ্রে মিশে সমুদ্রের জলের উচ্চতা অন্তত চারফুট পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবে। সমুদ্রের জলের উচ্চতা বাড়লে ভারত বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বহু জনপদ অনেকটাই ডুবে যাবে। কার্বন মনোক্সাইড প্রধানত যানবাহনের জ্বালানীর অসম্পূর্ণ দহনে তৈরী হয়। কার্বন মনোক্সাইড যদি বেড়ে যায়, তাহলে বিজ্ঞানী হলডেনের মতে শরীরের অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত করে। মাত্র ০.০১% কার্বন মনোক্সাইড আছে এমন বাতাসে চারঘন্টা শ্বাসকার্য চললেই, সুস্থ একজন লোকের মৃত্যু ঘটবে অক্সিজেনের অভাবে কিংবা মাথায় স্নায়ুগ্রন্থির ক্ষতি হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য যে ধূমপান করলেও এই কার্বন মনোক্সাইড ফুসফুসে ঢুকে যায়।

সালফারডাইঅক্সাইড তৈরী হয় কয়লা, পেট্রোল ইত্যাদি পোড়ানোর ফলে। আবার তামা বা দস্তা পোড়ালেও সালফারডাইঅক্সাইড তৈরী হয়। এই সালফারডাইঅক্সাইড বাতাসে যদি বেড়ে যায়, তাহলে জীবদেহে বিভিন্ন কোষের নিউক্লিয়াসের পর্যন্ত ক্ষতি হয়। আবার এই সালফারডাইঅক্সাইড বাতাসে জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে সালফিউরিক এ্যাসিড তৈরী হয়, যা এ্যাসিডবৃষ্টি হিসেবে ঝরে পড়ে। এই এ্যাসিড বৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি এবং ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়ে যায়। এমনও দেখা গেছে যে একদেশের কলকারখানা নিঃসৃত সালফারডাইঅক্সাইড অন্য দেশের অ্যাসিড বৃষ্টির কারণ হতে পারে। যেমন নরওয়ের শতকরা ৯০ ভাগ এবং সুইডেনের শতকরা ৭৫ ভাগ অ্যাসিড বৃষ্টির কারণ হিসেবে যথাক্রমে বৃটেন ও জার্মানীর কলকারখানা নিঃসৃত সালফারডাইঅক্সাইডকে দায়ী করা হয়।

ওজন গ্যাস সূর্যের রশ্মিতে উপস্থিত আলট্রাভায়োলেট রে বা অতিবেগুনী রশ্মিকে আটকে দেয়। এই রশ্মি জীবদেহে ক্যানসার সৃষ্টি করে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা জনিত ধোঁয়া এবং জেটবিমান প্রভৃতির ধোঁয়া পৃথিবীর ওজন গ্যাসের স্তর কমিয়ে হাল্কা করে দেয়। ফলে সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে এসে জীবদেহের ক্ষতিসাধন করতে পারছে।

ফসফিন গ্যাস বাতাসে বৃদ্ধি পেলে তা শ্বাসকার্যের সঙ্গে ফুসফুসে যায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয়ে এবং ফুসফুসে ক্ষত সৃষ্টি করে। ১৯৮৬ সালে ইরাক ইরান যুদ্ধে এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছিল শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে।

এ ছাড়াও রয়েছে মিথেন গ্যাস যা প্রায় কার্বনডাইঅক্সাইডের দোসর। মিথেনের যোগানদার হল ধানক্ষেত, জলাজায়জগা এবং জীবের মল। এছাড়া কয়লাখনি ও অনেক প্রাকৃতিক গ্যাস থেকেও মিথেন সৃষ্টি হয়।

এইসব গ্যাসগুলির বাইরে রয়েছে মহাজাগতিক ধূলিকণা এবং শিল্পক্ষেত্রে কয়লা প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে বাতাসে মিশ্রিত বস্তুকণিকা। পৃথিবীর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে সব থেকে বেশী কয়লা ব্যবহার হয়। এর ফলে কয়লা গুঁড়োর মেঘ পর্যন্ত তৈরী হয়। বিগত ১৮৯০ থেকে ১৯৯০ এই ১০০ বছরে ১৩.৫ লক্ষ টন সিলিকন, ১৫ লক্ষটন আরসেনিক, ১০ লক্ষর টনের কিছু বেশী নিকেল, ৯ লক্ষ টন সালফারডাইঅক্সাইড বাতাসে মিশেছে। এছাড়া, প্রতিবছর প্রায় ১০ হাজার টন মহাকাশজাত ধুলো পৃথিবীর বাতাসে জমা হচ্ছে। দেখা গেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের তুলনায় ২০% বেশী ধুলো বাতাসে মিশেছে।

বর্তমানে বিভিন্ন রকম জ্বালানী দহনের ফলে বছরে এক হাজার কোটি টন কার্বনডাইঅক্সাইড বাতাসে জমছে। এছাড়া জীবের শ্বাসক্রিয়া, উষ্ণপ্রস্রবণ এবং অগ্নুৎপাত ঘটিত দহন থেকেও আসছে কার্বনডাইঅক্সাইড। ভারতে যানবাহনের সংখ্যা ১৯৮০ সালের হিসেব অনুসারে ১২৫১৩৬০। এই সংখ্যা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির তুলনায় কম হলেও দিল্লী শহরের ধোঁয়া এবং ধুলোর ৩৪% আসে যানবাহনের গ্যাস থেকেই। ইদানিং পাঞ্জাবে, হরিয়ানায় ফসলের গোড়া পুড়িয়ে দেওয়াটাও একটা বড় উৎস হয়েছে।

১৯৭৯ সালের এক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে শুধু কলকাতার বাতাসে দূষণকারী পদার্থের মাত্রা হল ঃ

ভাসমান বস্তুকণা	৫৬০ টন প্রতিদিন
সালফারডাইঅক্সাইড	১২৩ টন প্রতিদিন
কার্বনমনোক্সাইড	৪৫০ টন প্রতিদিন
হাইড্রোকার্বন	১০২ টন প্রতিদিন
নাইট্রোজেন অক্সাইড	৭০ টন প্রতিদিন

বর্তমানে এগুলির চতুর্গুণ বৃদ্ধি ঘটেছে। ভারতে বছরে ২৩৫ লক্ষ টন বায়ুদূষণ পদার্থের মধ্যে ৬৩% আসে কলকারখানা থেকে, ২৯.৮২% গৃহস্থালী কাজকর্মের ফলে এবং ৬.৭৬% আসে যানবাহন থেকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে কাঠ ও ঘুঁটের

জ্বালানীর ফলেও মারাত্মক ক্ষতি হয়। বিগত কিছু বছরে কৃষি জমিতে ধান এবং গমের গোড়াটুকু পুড়িয়ে দিয়ে যে দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে, তা অতীতের কাঠ এবং ঘুঁটের দহনের থেকে অনেক বেশী দূষণ ঘটাচ্ছে। গরুর গোবর যা সার হিসেবে ব্যবহার করলে আটটি সিন্ধ্রির সার কারখানায় যত পরিমাণ নাইট্রোজেন সার তৈরী হয়, তার সমপরিমাণ সার পাওয়া যেত, তার প্রায় সবটাই জ্বালানী হিসেবে পুড়ে যাচ্ছে। কলকারখানার শ্রমিকের তুলনায় গ্রামের মেয়েরা প্রতিদিন রান্নার সময় অনেক বেশী দূষিত বাতাসের মুখোমুখি হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, গুজরাটের গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা রান্নার সময় ৭০০০ মিউগ্রাম/কিউবিক মিটার ভাসমান বস্তুকণার মুখোমুখি হয়। অথচ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এই বস্তুকণার সহনীয় মাত্রা ২০০০ মিউগ্রাম/কিউবিক মিটার। রান্নার গ্যাসের দামবৃদ্ধি পাবার ফলে গ্রামের দরিদ্র মানুষ আগের প্রাচীন জ্বালানীর যুগে ফিরে গিয়েছে।

চার

এই মুহূর্তে পৃথিবীতে যা গাছপালা রয়েছে, তাতে করে কেবলমাত্র উদ্ভিদের দ্বারাই বছরে ১৬০০ কোটি টন কার্বনডাইঅক্সাইড শোষিত হতে পারে। দেখা গেছে একটি পরিণত বটগাছ ঘন্টায় ২২৫২ কেজি কার্বনডাইঅক্সাইড শোষণ করে, এবং ঘন্টায় ১৭১২ কেজি অক্সিজেন উৎপাদন করতে পারে।

তিন দশক আগে একটি হিসাবে দেখা যায় হেক্টর প্রতি যদি ৪৫০টি গাছ থাকে, আর তাদের গড় আয়ু যদি ৫০ বছর হয়, তাহলে এই নির্দিষ্ট ৫০ বছরের মধ্যে ওই ৪৫০টি গাছের দরুণ আর্থিক লাভ হবে ১৪১.৩০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ওই ১ হেক্টর জমিতে যে ৪৫০ টি গাছ আছে, ৫০ বছরে তা থেকে পাওয়া যাবে ঃ

অক্সিজেন	২২.৫০ লক্ষ টাকা
বায়ুকে দূষণমুক্ত করা	৪৫.০০ লক্ষ টাকা
ভূমি সুরক্ষা	২২.৫০ লক্ষ টাকা
বাতাসে আর্দ্রতা রক্ষা	২৭.০০ লক্ষ টাকা
কাঠ উৎপাদন	২৪.৩০ লক্ষ টাকা
মোট	১৪১.৩০ লক্ষ টাকা

বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন পরীক্ষায় জানা গেছে যে সামগ্রিকভাবে ৩৩% অরণ্য সুরক্ষিত থাকলেই প্রতিবেশ রক্ষা করা যায়। বায়ুদূষণটা রোধ করা যায়।

অথচ এই ৩৩% অরণ্যও কিন্তু সুরক্ষিত নয়। সারা দুনিয়ায় তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ আজও জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করেন নানা প্রয়োজনে (Openshaw 1974)। ভারতে আদিবাসী পার্বত্য উপজাতি দরিদ্র জনগণের শতকরা ৮০ ভাগ

থেকে পঁচানব্বই ভাগ লোকই রান্নার আঁচের জন্যে জ্বালানীকাঠ ব্যবহার করেন। হিসেবে দেখা গেছে তাঁরা প্রতিবছর মাথাপিছু গড়ে এক টন হিসেবে কাঠ ব্যবহার করেন। এই পরিমাণের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ অবশ্য থাকতে পারে। পরিমাণ কম বা বেশীটা এখানে সমস্যা নয়। পরিমাণ কিছু কমও যদি হয়, তবুও অবস্থাটা কী দাঁড়াতে পারে? এছাড়া কাগজ, সেলোফেন, রেয়ন শিল্পেও কাঠের ব্যবহারের বৃদ্ধি পেয়েছে।

একটা হিসেব খুবই উল্লেখযোগ্য ঃ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক স্বর্গীয় ডঃ তারকমোহন দাসের মত হল, আমাদের দেশে শতকরা ৩২ ভাগ মানুষ লিখতে পড়তে পারে, বাকী শতকরা ৬৮ ভাগ মানুষ অক্ষরজ্ঞান বর্জিত। এই ৬৮ ভাগ মানুষকে যদি শিক্ষিত করে তুলতে হয় তাহলে তাদের বইখাতার জন্যে যে কাগজ তৈরী করতে হবে, তাতে ভারতের যে অবশিষ্ট বনভূমি আছে তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে কোনটা বেছে নেব, অরণ্য সংরক্ষণ নাকি শিক্ষা বিস্তার? যদি বলি দুটোই সমান দরকারী, তাহলে ব্যাপারটা সত্যিই কি খুব জটিল হয়ে যাবে না? আবার এও দেখা গিয়েছে ঝরে পড়ে পাতার স্তূপে অরণ্য ঢাকা পড়ে যায়, মানে অরণ্যের মাটিই ঢাকা পড়ে আর কি। এগুলো কিন্তু অরণ্যের গাছপালার পক্ষে খুবই দরকারী। কারণ জঙ্গলে তো কেউ সার দিতে যায় না। এই সব ডালপাতাগুলোই বৃষ্টির জলে পচে সার হয়। এখন জ্বালানীর চাহিদা মেটাতে গিয়ে যদি আমরা অরণ্যের মাটি ঝাঁট দিয়ে ঘরের মেঝের মতন পরিষ্কার করে ফেলি, তাহলে অরণ্যের মাটি সার পাবে না।

একমাত্র প্রতিকার হিসেবে এসব ব্যাপারে একটাই কাজ করা দরকার। কাগজ বা জ্বালানী যাই হোক, গাছ কাটা দেখা যাচ্ছে প্রয়োজন। সুতরাং যে সব গাছ দ্রুত বাড়ে সেগুলি যদি যে হারে কাটা হচ্ছে, সেই হারে লাগানো হয়, তাহলে অনেকটা কমে যাবে। যেমন সুবাবুল, আকাশমণি প্রভৃতি গাছগুলি এইভাবে কাজে লাগানো যায়। এদের নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে ডালপালা ছেঁটে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করলেও আবার তা পূরণ হয়ে যায়।

পাঁচ

বায়ুদূষণের সঙ্গে সঙ্গেই আরো যে গুরুত্বপূর্ণ ইকোসিস্টেমটির নিয়মিত দূষণ ঘটেছে তা হল জল।

পৃথিবীর তিনভাগে জল, একভাগ স্থল। তবুও পানীয় জলের অভাব। যে চেরাপুঞ্জী এবং মৌসিনরাম দুনিয়ার সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের জায়গা হিসেবে এতকাল চিহ্নিত ছিল, সেই চেরাপুঞ্জী মৌসিনরামেও পানীয়জলের জন্যে গ্রামের মহিলাদের

আজকাল দু-তিন মাইল পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে।

আমরা নাকি কেবল ভূনিম্নস্থ জলই পান করতে পারি। জলবন্টন তালিকা অনুযায়ী তার পরিমাণ ঃ

মহাসাগরীয় জল	৯২.৮
ভূনিম্নস্থ জল	৪.২
মেরু অঞ্চলের বরফগলা জল	২.০
নদী হ্রদ ও অন্যান্য জলাশয়ের জল	০.৬৫
বায়ুমন্ডলে বিদ্যমান জল	০.৩৫

জল দূষিত হচ্ছে নানাভাবে। শহরাঞ্চলের সমস্ত ময়লা আবর্জনা বিভিন্ন নর্দমা ও খাল মারফৎ নদীতে ফেলা হয়। হিসেবে দেখা গেছে শুধুমাত্র আমেরিকার নিউইয়র্ক শহর থেকেই প্রতিদিন ২০০০০ গ্যালন জঞ্জাল ফেলা হয় হাডসন নদীতে। বোম্বাই শহরের সমস্ত জঞ্জাল আরব সাগরে, কলকাতা ও হাওড়া শহরের জঞ্জাল গঙ্গায়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের রাজধানী দিল্লীর পয়ঃপ্রণালী নির্গত দূষিত জল যমুনায় ফেলে সেবার লক্ষাধিক লোক জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়। বিহারের বারাউনির তেল শোধনাগারে অশোধিত তরল গঙ্গাবক্ষে কয়েক কিলোমিটার ব্যাপী অগ্নিকান্ড ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল। যমুনা শোধনের নামে নদীবক্ষে দুধ ঢেলে দেওয়াও দূষণেরই নামান্তর। এবং আটলান্টিক মহাসাগরের ভাসমান আবর্জনা স্তূপের কথাও আজ প্রায় সর্বজনবিদিত। বিগত ৫০ বছরে প্রায় ১০০০ ধরনের জলজ প্রাণী ও সামুদ্রিক উদ্ভিদের মৃত্যুর কারণ জলদূষণ।

ভারতে সবুজ বিপ্লবের ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য এবং কীটানশক হিসেবে কৃষিক্ষেত্রে যে সুপার ফসফেট প্রভৃতি সার এবং ফলিডল, ডি.ডি.টি. প্রভৃতি ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদী পুকুর খাল প্রভৃতিতে মিশে যায় এবং জল বিষাক্ত হয়। ভারতে প্রায় ১০০ ধরনের রাসায়নিক বিষ ব্যবহৃত হয় এই খাতে। ১৯৭৩-৭৪ সালে এইখাতে ৭৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল বর্তমানে তা কয়েক শতকোটি ছাড়িয়েছে। বলাবাহুল্য উদ্ভিদ মাটি থেকে জল শোষণের সময় এই বিষও শোষণ করে। তার ফলে শাকসব্জী ফলমূল এমনকি গো দুগ্ধ পর্যন্ত কলুষিত হচ্ছে। শিল্প নিঃসৃত বিষাক্ত আবর্জনার অন্যতম হচ্ছে পারদ। তরল এই আবর্জনা নিকটবর্তী হ্রদ বা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। অল্প পরিমাণ পারদের প্রভাবে মাথাব্যথা, ক্লান্তি, কিডনি, স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্লাসটিক এবং কাগজ শিল্পের মূল আবর্জনা এই পারদ। ভিনাইল ক্লোরাইড উৎপাদন কারখানা থেকেও আবর্জনা হিসেবে পারদ আসছে। ধাতু শিল্পের আবর্জনা হল ক্যাডমিয়াম, এর বিষক্রিয়ায় কিডনী জখম, রক্তচাপ বৃদ্ধি, শরীরের হাড় দুর্বল হতে পারে।

পানীয় জলের কি কি গুণাবলী থাকা দরকার? এ প্রসঙ্গে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছেন ঃ

জলের অম্লতা (ph) ৭-৮.৫

জলে মোট কঠিন বস্তুর পরিমাণ ৫০০ মিগ্রা /লিটার

জলের হার্ডনেস	২ মিঃ ইকিউভ্যালেন্ট/লিটার
লোহা	০.১ মিগ্রা/লিটার
ম্যাঙ্গানিজ	০.০৫ মিগ্রা/লিটার
তামা	০.০৫ মিগ্রা/লিটার
দস্তা	৫মিগ্রা/লিটার
ক্যালসিয়াম	৭৫ মিগ্রা/লিটার
ম্যাগনেসিয়াম	৬০ মিগ্রা/লিটার
সালফেট	২০০ মিগ্রা/লিটার
ক্লোরাইড	২০০ মিগ্রা/লিটার
ফেনোলিক যৌগ	০.০০১ মিগ্রা/লিটার

এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির ভিত্তিতে আরো নানা মাপকাঠি আছে। যেমন আর্সেনিক সীসা এবং সায়নাইডের পরিমাণ ০.০৫ মিগ্রা/লিটার, এর চেয়ে বেশি হলে সে জল শুধু পানের জন্যেই নয় গৃহস্থালী কাজেরও অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

এ ছাড়া বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জানাচ্ছেন ঃ

জলে নাইট্রেটের পরিমাণ ১ মিগ্রা/লিটারের বেশী হওয়া অনুচিত। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ৫মিগ্রা/লিটারের কম হওয়া অনুচিত এবং ক্লোরাইডের মাত্রা ০.৫-০.৪ মিগ্রা/লিটারের মধ্যে থাকা দরকার। প্রসঙ্গত একথা বলা খুবই জরুরী যে, জীবদেহের ৭০ ভাগ অংশই হচ্ছে জল। তাই জলের অভাবে দেহের ওজন ১০/২০ শতাংশ কমে গেলে জীবন ধারণ করা কষ্টকর হবে। প্রতিটি জীবকোষের ৭৫/৮৫ শতাংশ হচ্ছে জল।

দেহের বিভিন্ন কলাকোষ দেহের ওজনের শতকরা কত ভাগ এবং ঐ সমস্ত কলাকোষে নিহিত জলের শতকরা হিসেব হল ঃ

দেহকলা	দৈহিক ওজনের শতকরা ভাগ	দেহকলার শতাংশ হিসেবে জলের পরিমাণ
পেশী	৪২	৭৬
দেহচর্ম	১৮	৭২
রক্ত	৮	৮৩
বৃক্ক	০.৪	৮৩
মস্তিষ্ক	২	৭৫

উপরের সারণী থেকেই দেহে জলের প্রয়োজন কত ,সেটি স্পষ্ট বোঝা যায়। মলমূত্র ত্বক ও ফুসফুসের কাজকর্মে প্রতিদিন প্রচুর জল দেহ থেকে নিষ্ক্রিয় হয়। সাধারণ অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির প্রতিদিন ২৫০০ মিলি লিটার জল দরকার হয়।

পান, রান্না, স্নান, ধোয়ামোছা, বাথরুমের জন্য, বাগান করা প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যবহৃত জলকে গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় জল বলা যায়। ভারতীয় পরিবেশে লোক সংখ্যা ১০০০০ এর কম হলে এই প্রয়োজন ধরা হয় মাথাপিছু ৭০ লিটার। লোকসংখ্যা ৫০০০০ এর বেশী হলে প্রয়োজন ২০০ লিটার পর্যন্ত ওঠে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে ঘরে জলের ব্যবস্থা থাকে না, সেখানে মাথাপিছু ৪০ লিটার জল সরবরাহ করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে যেমন অফিস স্কুল কলেজ কারখানা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ৪৫ লিটার মাথাপিছু ধরা হয় যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ছাড়া। এছাড়া আছে গবাদি পশু, আগুন নেভানো, প্রভৃতি খাতে প্রয়োজন। এই বিপুল জলের উৎস হচ্ছে তিনটি। ভূ-পৃষ্ঠের জল, মাটির নীচে জল, এবং বৃষ্টির জল। এই উৎসগুলি থেকে প্রাপ্ত জল যে সবসমসয় বিশুদ্ধ হয় তা নয়। সুতরাং তার গুণাগুণ পরীক্ষাও দরকার।

ভৌত পরীক্ষা	রাসায়নিক পরীক্ষা	জীবাণুগত পরীক্ষা
গন্ধ, রং	মোট কঠিন পদার্থ	মোট ব্যাকটেরিয়া
	খরতা	গণনা
স্বাদ ও	ক্ষারীয় ভাব, অম্লতা,	
	ক্লোরাইড	
পংকিলতা	লোহা ম্যাঙ্গানিজ ও	
	ফ্লুরাইড	

বিভিন্ন রকমের পচা গাছগাছড়া পাতা নর্দমার জল শিল্পাঞ্চলের জল ইত্যাদির দ্বারা জলের স্বাদ গন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়। গন্ধ পরীক্ষা করা হয় অসমোস্কোপ দিয়ে। মশলাগন্ধী, ঘেমো, মেছো, মেটে, গাঁজালো প্রভৃতি বিশেষণে গন্ধ বোঝানো হয়। বিভিন্ন জৈব পদার্থের উপস্থিতি এবং লোহা ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের জঞ্জাল ইত্যাদি দ্বারা শিল্পাঞ্চলের জল প্রভাবিত হয়।

জলের মধ্যে উপস্থিত কঠিন বস্তুর পরিমাণ বুঝতে হলে জলকে বাষ্পীভূত করলেই কঠিন বস্তু সকল তলায় পড়ে থাকে তলানি হিসেবে।

জলের সাময়িক খরতা দূর করতে হলে ফোটানো দরকার, আর স্থায়ী খরতা দূর করতে জলে সোডিয়াম কার্বোনেট মিশিয়ে নিলেই চলবে। জলের খরতা কতখানি মাপতে হলে সাবানের ফেনা হচ্ছে কিনা দেখা দরকার।

জলে অতিরিক্ত পরিমাণ লোহা এবং ম্যাঙ্গানীজ থাকলে সেই জলের স্বাদ হবে তেতো এং ধাতব। এই পরিমাণ লিটারে ০.০৩ এবং ০.১ মিলিগ্রামের বেশী হওয়া

উচিত নয়। জলে ফ্লুরাইড বেশী থাকলে দাঁতের এনামেল নষ্ট হয় আর ফ্লুরাইড কম থাকলে দাঁতের ক্ষয় রোগ হয়। জলে ক্লোরাইডের পরিমাণ বাড়লে জল নোনতা হয়ে যাবে। জলবাহিত রোগকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ভাইরসজাত	ব্যাকটেরিয়াজত	প্রোটোজোয়াজাত	হেলমিন্থজাত
হেপাটাইটিস	কলেরা	অ্যামিবায়োসিস	ক্রিমিরোগ
পোলিও	আমাশা	জিয়ার্ডিয়াসিস	
	টাইফায়েড		
	প্যঅরাটাইফয়েড		
	উদরাময়		

উন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু জল সাপ্লাই করা হয় ৩৫০ লিটার, সেখানে ভারতবর্ষে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কোড অফ বেসিক রিকোয়ারমেন্ট ফর ওয়াটার সাপ্লাই যে পরিমাণ বেঁধে দিয়েছেন তা হল ঃ

ব্যবহার	দৈনিক মাপাথাপিছু প্রয়োজনের পরিমাণ (লিটারে)
রান্না	৫
পান	৫
স্নান	৫৫
কাপড় কাচা	২০
বাসন ধোয়া	১০
ঘর পরিষ্কার	১০
ল্যাট্রিন পরিষ্কার	৩০
	১৩৫

কারখানা যেখানে বাথরুম আছে	৪৫ লিটার
কারখানা যেখানে বাথরুম নেই	৩০ লিটার
১০০ টির বেশী শয্যা নয় এমন হাসপাতাল	৩৪০ লিটার
১০০টির বেশী হলে হাসপাতাল	৪৫০ লিটার
অফিস	৪৫ লিটার
রেস্টুরেন্ট (আসন পিছু)	৭০ লিটার
স্কুল (অনাবাসিক)	৪৫ লিটার
স্কুল (আবাসিক)	১৩৫লিটার
বাগান বা খেলার মাঠ	৩.৫লিটার প্রতি বর্গমিটার
পশু/গাড়ি	৪৫ লিটার

মুস্কিল হচ্ছে এই পরিমাণ জলও ভারতের সর্বত্র সহজ প্রাপ্য নয়। পরিশুদ্ধ বীজাণুমুক্ত জলতো নয়ই। যতটুকু পাওয়া যায়, তাও রাসায়নিক বিষ প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত। শিল্পনিঃসৃত বিষাক্ত আবর্জনার একটি হল পারদ। প্লাস্টিক, কাগজ এবং ভিনাইল ক্লোরাইড উৎপাদনের কারখানা থেকে পারদ বেরিয়ে আসে বর্জ্য পদার্থ হিসেবে এবং হ্রদ পুকুর নদীর জলে মিশে যায়। মানুষের দেহে খুব অল্প পরিমাণ পারদের প্রতিক্রিয়াও খুব মারাত্মক। মাথাব্যথা, ক্লান্তি, কিডনী, বা স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি এমনকি পক্ষাঘাতও হতে পারে। WHO এর মতে মানুষের দেহে খাদ্যে বা পানীয়ে ০.০৫ PPM (parts per Miilion) হল পারদ গ্রহণের সর্বোচ্চ মাত্রা। ধাতু শিল্পের আবর্জনা হিসেবে বেরিয়ে আসা ক্যাডমিয়ামও পানীয় জলে মিশে কিডনী জখম করে এবং শরীরের হাড় দুর্বল করে দেয়।

আরেকটি ইকোসিস্টেম হচ্ছে মাটি, তার বিষয় অন্যসময় বিশদ্ আলোচনা করব। তা না হলে এই লেখাটি অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে। পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

সাত

এখন প্রশ্ন হল আমরা এসবের জন্যে কী করতে পারি?

এদেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর দরিদ্র। প্রতিবেশ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও এই বিপুল সংখ্যক মানুষের নেই। সুতরাং তিনভাবে আমরা এই প্রতিবেশ ধ্বংস করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারি।

প্রথম পর্যায়ে মানুষকে বিষয়টির ভয়াবহতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধ্যানধারণা দিতে হবে। দ্বিতীয়ত তাদের সংগঠিত করে তুলতে হবে। তৃতীয়ত ব্যাপকভাবে সুপরিকল্পিত উপায়ে বনসৃজনে নজর দেওয়া এবং সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে যে মুষ্টিমেয় লোভ লালসা চরিতার্থ করার জন্যে চেষ্টা চলেছে, তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সংবাদপত্রে এমন খবরও পাওয়া গিয়েছে যে ধনী দেশগুলি তাদের কলকারখানাগুলি থেকে বেরিয়ে আসা রাসায়নিক জঞ্জাল দরিদ্রদেশে গিয়ে ফেলে আসছে জাহাজ বোঝাই করে। আবার গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষকে বঞ্চিত করে শহরাঞ্চলে বিলাস বৈভবে জীবন যাপন করার জন্যেও চলছে কলকারখানা ভিত্তিক কর্মযজ্ঞ, যা প্রতিবেশ দূষণের একটি প্রধান কারণ। চলছে পরমাণু বোমা থেকে শুরু করে তার পরিকল্পনা, চলছে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রস্থাপনের চেষ্টা। যার কোনটিই বৃহৎ সংখ্যক মানুষের কোন উপকার আসে না। সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপারেই গ্রামীন দরিদ্র মানুষকে সচেতন করে তোলা দরকার। তার জন্যে চাই বিভিন্ন পরিকল্পনা।

যেমন ঃ

১। গণমাধ্যমগুলিতে প্রতিবেশ সম্পর্কে শিক্ষাপ্রচারকে বাধ্যতামূলক করা।

২। নিরক্ষর মানুষের কাছে চার্ট, পোষ্টার, স্লাইড প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার চালানো।

৩। গ্রামীণ বস্তি ও তপশীল এলাকাগুলিতে তথ্যচিত্র দেখানো।

৪। বিদ্যালয়গুলিতে পাঠক্রম হিসেবে প্রতিবেশকে অন্তর্ভুক্ত করা।

(ক) বিদ্যালয়গুলিতে বৃক্ষরোপণ উৎসব।

(খ) বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত প্রদর্শনী।

(গ) ভ্রাম্যমান বনপালন বিদ্যার প্রদর্শনী।

(ঘ) বিদ্যালয় বাগান প্রতিযোগিতা।

(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্পে বিদ্যালয়গুলির অংশগ্রহণ।

(চ) বিদ্যালয়গুলিতে শাকসব্জি ফলনের প্রতিযোগিতা।

(ছ) বন পালন বিদ্যা ব্যাপারে বিদ্যালয়ে ভ্রমণে অংশগ্রহণ।

(জ) ফুল প্রদর্শনী এবং মুক্ত অঞ্চলে বেড়ানো।

(ঝ) উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে প্রতিবেশকে অবশ্য পাঠ্য বিষয় করা।

৫। ক্যাম্প সেমিনার, কর্মশিবির প্রভৃতির মাধ্যমে আঞ্চলিক পর্যায়ে মত বিনিময়।

৬। জনসংখ্যারোধে গণমাধ্যমসহ অপরাপর সরকারী মাধ্যমগুলিকে সাহায্য করতে বাধ্য করা।

৭। আর্থসামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

৮। বাস্তু সংস্থান বিষয়ে গবেষণা করা যাতে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা সহজ হয়।

৯। জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্রে নানা জায়গায় জমি সৃষ্টি করা।

১০। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মানুষের প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি গাছ লাগাতে উৎসাহী করে তোলা।

এত দূষণ, মিডিয়াগুলোর দায়িত্ব আছে বলে মনে হয় না

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কথাসাহিত্যিক

একথা সত্য যে যৌথ পরিবারে ফিরে যাওয়া পরিবেশকে বাঁচানোর একটা পথ। এখন তো চাষের জমি দখল করে বাড়ি হচ্ছে। কলকারখানা বন্ধ করে বাড়ি হচ্ছে। যত পরিবার ভাগ হবে, তত বাড়ির সংখ্যা বাড়বে, উনুন বেশি জ্বলবে। এ একটা দুষ্ট চক্রের মতন।

বিদেশে দেখেছি বাড়ি হয় সামনে পিছনে অনেক জায়গা ছেড়ে। ওরা তো ভোগবাদে বিশ্বাসী। যেমন ভূতের মত খাটে। তেমনি জীবনকে ভোগও করে। জীবনযাপনকে আরামদায়ক করতে গিয়ে পরিবেশ দূষণও বাড়াচ্ছে। একটা লোকের ৪/৫ টা করে গাড়ি। যত গাড়ি তত দূষণ। তবে ওরা থাকে খুব হাইজিনিকভাবে। আমি তো বারংবার দূষণহীন ফুয়েলের কথা বলেছি। এখন হচ্ছেও, যেমন ব্যাটারিচালিত গাড়ি। এই ব্যাটারিগাড়িগুলি হয়তো ততোটা আরামদায়ক নয়। গতি কম। সেজন্যে হয়তো খুব বেশি চলছে না। কিন্তু তার বদলে যা চলছে তা পৃথিবীর জন্যে বিপজ্জনক।

প্যারিসে যে জলবায়ু সম্মেলন হল, আমেরিকা দূষণের দায় স্বীকার করেছে। এখন ওরা কী করে দেখা যাক। ওরা যখন বুঝবে যে একটু পিছিয়ে আসা দরকার, হয়তো করবে। কিন্তু আমাদের দেশে তো কোনরকম চেষ্টাই নেই। অস্ট্রেলিয়াতে

দেখেছি রোদ কত অসহ্য হয়ে গেছে। আমাদের দেশেও খানিকক্ষণ রোদে থাকলে অস্বস্তি হয়। অস্ট্রেলিয়ার রোদ্দুরে জ্বালা পোড়া ভাব হয়। আমার মনে হয় আসলে যেটা ঘটেছে তা হচ্ছে, ওজোন হোলটাতো দক্ষিণ মেরুর উপরে। বিশাল বড়, প্রায় ইউরোপ মহাদেশের মত সাইজ। ফলে সূর্যের আলো সরাসরি এসে পড়েছে। অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে যে রোদটা, সেটা অস্বাস্থ্যকর। এজন্য ওরা যখন বাইরে বের হয়, সানস্ক্রীন ক্রিম মেখে নেয়। নাহলে চামড়া এমনভাবে পুড়ে যায়, ক্যানসার হতে পারে।

এত দূষণ, তবু মিডিয়াগুলোর কোন হেলদোল বা দায়িত্ব আছে বলে মেন হয় না। তবে শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথা বলে লাভ নেই। বিপর্যয় এলে সারা পৃথিবীতেই আসবে। মধ্যপ্রদেশে দেখেছি লোকসংখ্যা অনেক কম। অনেক ফাঁকা জমি আছে। সেটা একদিকে ভালো। পশ্চিমবঙ্গে দূষণও বেশি। সেটা কমাবার কোন চেষ্টাও নেই। ভারতবর্ষে কমবেশি সর্বত্রই একই চিত্র। দিল্লিতে এত দূষণ কেন? নগরায়ণ সেখানে বেশি। আবার গাছপালা লাগানো, জঙ্গল তৈরি, বড় বড় চওড়া রাস্তা সবই হচ্ছে। খুব ভাবনার কথা। জীবজন্তুর কথা বলতে গেলে বলব যে গৃহপালিত পশু মোটামুটি ভাল থাকে। তারা ধ্বংস হয়ে যাবে না। বন্যপশুদের খুব বিপদ। এই যে পাখিরা বড় বড় গাছে আশ্রয় নিত। এখন গাছ সব কেটে উড়িয়ে দিচ্ছে, চিল শকুন আর দেখতে পাওয়া যায় না। এই পরিবেশে পশুপাখিরা আরও বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। এই যে বলা হয় মোবাইল টাওয়ারের জন্যে পাখি কমে গেছে। আমার সেটা মনে হয় না। আসলে চড়াই পাখি বাসা বাঁধে মানুষের বাড়িতে। মানুষ যদি তার ব্যবস্থা না রাখে তাহলে ওরা থাকবে কি করে? আমরা আগে যে বাড়িতে ছিলাম, সেখানে বইয়ের র‍্যাক ছিল। ওরা সেখানে বাসা বাঁধতো, আমি ওদের বাসা ভাঙার ভয়ে ওই বইগুলি নামাতাম না। খুব কম করেও ২০/২৫ টা বাসা ছিল। টেবিল ফ্যান কিনে নিয়েছিলাম। সিলিং ফ্যান চালালেই ওরা মরবে। মরেও ছিল কয়েকটা। সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। এখন জানি না, নিশ্চয়ই সে বাসা আর নেই। আসলে আমরা চড়াই পাখিদের সেই পরিবেশটা দিতে পারছি না। চড়াই পাখি, শালিক পাখি কমে যাচ্ছে। সবরকম জীবজন্তুই কমে যাচ্ছে। বাঘতো এখন শ'য়ে নেমে এসেছে। একসময়তো বাঘ শিকার করার মধ্যে বাহাদুরি ছিল। এত বাঘ মেরে ফেলাটা ঠিক হয়নি। আর বাহাদুরিই বা কিসে? বাঘের তো বন্দুক নেই। সে তো দাঁত নখ দিয়ে লড়াই করে। তাকে তুমি দূর থেকে বন্দুক দিয়ে মারছো। এটাতো বাহাদুরি নয়, কাপুরুষতা। সাপ নিয়ে এত দুশ্চিন্তা ছিল, সেই সাপও শেষ হতে বসেছে।

জীবজন্তুর উপর অকারণ নিষ্ঠুরতা আছে। কিন্তু মানুষের মাংস খাওয়াতে যতদিন আসক্তি থাকবে, ততদিনই এসব চলবে। যে রোজ মুরগী খাচ্ছে, তারতো মুরগীর উপর কোনও মমতা থাকার কথা নয়।

যে বলিদান দেখে কেঁদে ফেলে, সেই মাংস রান্না হলে আবার দারুন খুশি হয়ে যায়। এটা আমাদের সমাজে একটা অদ্ভুত প্যারাডক্স। একটা ঘটনা আমি আনন্দবাজারে লিখেছিলাম। আমরা তখন বালিতে থাকি। স্ত্রী ছেলেমেয়েদের প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়ে রেখে টিকিট কাটতে গেছি, আওয়াজ পেলাম একটা ট্রেন থ্রু চলে গেল। তারপর খুব হৈ হৈ। দেখলাম একটা ভীড় লাইনের উপর কিছু দেখছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বৌ আর বাচ্চা মেয়েটাকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। দৌড়ে নেমে এলাম। দেখি একটা ছোট্ট ছাগলছানা, তার চারটে ক্ষুর কাটা পড়েছে, সে ছটফট করছে। বাঁচবে না বোঝাই যাচ্ছে। সবাই জল-টল দিচ্ছে, আহা, আহা করছে। বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছিল, তাদের অনেকের চোখে জল। অথচ সেখান থেকে মাত্র বিশগজ দূরেই পাঁঠার মাংসের দোকান। সেখানে ছাল ছাড়ানো পাঁঠা ঝুলছে। মানুষ সেখান থেকে মাংস কেটে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্যারাডক্সটাতো আমাদের আছেই।

মানুষ খাওয়ার জন্য মুরগী ছাগল হাঁস গরু ইত্যাদি হত্যা করে। একজনের চোখের সামনে আরেকজনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে। ওদেরও যে ব্যথা বেদনা, যন্ত্রণা দুঃখ কষ্ট ভয় ইত্যাদি অনুভূতি আছে, সেসব চিন্তাই কেউ করে না। আসলে মানুষের মানবিকতা, অসহায়ের প্রতি মমতাবোধ এগুলো কমে যাচ্ছে। সে শুধু নিজের প্রয়োজন, নিজের স্বার্থ এইসবই বুঝতে শিখছে। আমার মনে হয় এর জন্যে মা-বাবারা দায়ী। শৈশব থেকে এই শিক্ষাটা দিতে হয়। সব থেকে নিষ্ঠুরতা দেখা যায় বাচ্চাদের মধ্যে। অনায়াসে ফড়িং-এর ডানা ছিঁড়ে দেয়। পাখির পাখনা কেটে দেয়। কুকুর বেড়ালকে ঢিল মারে। এসব তারা করে খেলাচ্ছলে। অন্য প্রাণীর কষ্ট যন্ত্রণাটা তারা বোঝে না। ওই প্রাণীদেরও যে কষ্ট হয়, সেই বোধটা বাচ্চাদের মধ্যে সঞ্চারিত করাটা বাবা-মায়ের কাজ। মা-বাবার শিক্ষাই শিশুরা গ্রহণ করে। আর ছেলেবেলায় মানুষ যা শেখে, সেটাই সারাজীবন থাকে। বাবা মাকে শিক্ষিত করে তোলাটাই প্রথম কাজ। *

---

* ভয়েস অফ নেচারের সৌজন্যে

উন্নয়ন ঃ প্রথম সংকলন, মে-জুলাই ২০২৩

সবুজ সংঘ

রেজিস্ট্রিকৃত কার্য্যালয় ঃ
গ্রাম এবং পোস্ট : নন্দকুমারপুর
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পিন : ৭৪৩৩৪৯, পশ্চিমবঙ্গ

প্রশাসনিক কার্যালয়
৩০/৯ রাজডাঙা মেইন রোড (পূর্ব)
কলকাতা : ৭০০১০৭, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : + ৯১৩৩৪০৭২৩৫৭৭

অন্যান্য কার্যালয়

আলোর দিশা
গ্রাম এবং পোস্ট : চম্পাহাটি
থানা: বারুইপুর, জেলা :দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পিন : ৭৪৩৩৩০, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : +৯১০৩২১৮২৬১১৪৩/৪৪,
৯০০৭০১১৩৩০

সবুজ সংঘ -পাথরপ্রতিমা
গ্রাম পোস্ট : হেরম্বগোপালপুর
থানা : পাথরপ্রতিমা,
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পিন : ৭৪৩৩৮৩, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : +৯১৮১১৬৫৫৬৮১৩,

সবুজ সংঘ আলিপুরদুয়ার
মাধাপাড়া, ওয়ার্ড নং ৪
গ্রাম পোস্ট : আলিপুরদুয়ার
জেলা : আলিপুর দুয়ার
পিন : ৭৩৬১২১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : +৯১৮৩৪৮৫৮৭৫০১,
৯০৬৪০২৭৪৮১

সবুজ সংঘ - পূর্ব মেদিনীপুর
শেরপুর, মেচেদা বাইপাস, কাঁথি
জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
পিন : ৭২১৪০১

সবুজ সংঘ গঙ্গাসাগর
গ্রাম পোস্ট : রুদ্রনগর
থানা : সাগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পিন : ৭৪৩৩৭৩, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : + ৯১৯৭৩৫২০৮০৩৩,
৯৫৬৩০৯৮৮৭৮

ওয়েবসাইট : www. /sabujsangha.org
টুইটার : twitter.com / sabujsangha1
ফেইসবুক :
facebook.com / sabujsangha.NGO
ইনস্টাগ্রাম :
instagram.com/sabujsangha
ইউটিউব :
youTube.com/user/director2431

সবুজ সংঘ, ৩৩/৯ রাজডাঙা মেইন রোড, (পূর্ব) কলকাতা : ৭০০১০৭ থেকে শ্রী অংশুমান দাস দ্বারা প্রকাশিত এবং ড: দীপংকর রায় দ্বারা সম্পাদিত ও সহযাত্রী, ৮, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ দ্বারা মুদ্রিত।